ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

এপ্রিল ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

উন্নয়নের দিগন্তে উত্তর-পূর্ব ভারত

ভারতের পুবে তাকাও নীতি
সঞ্জয় হাজারিকা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান : ভবিষ্যতের দিশা
ন্যাটালি ওয়েস্ট খারকোঙ্গর

স্বাস্থ্য ও লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন
অরুণা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

ফোকাস

উত্তর-পূর্বের কৃষিকাজ পরিবেশ-বান্ধব চাষাবাদের পদ্ধতি দেখিয়েছে সমৃদ্ধির দিশা
নীরেন্দ্র দেব

বিশেষ নিবন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : আদিবাসী জনসংখ্যার সার্বিক বিকাশ কোন পথে?
নরেশ সি সাক্সেনা

গ্যাংটকে জৈব কৃষি গবেষণার জন্য জাতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে সম্প্রতি জৈব কৃষি গবেষণার জন্য একটা জাতীয় ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। নাম 'ন্যাশনাল অর্গ্যানিক ফার্মিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (সংক্ষেপে এনওএফআরআই)। সিকিমকে হালেই দেশের প্রথম 'অর্গ্যানিক স্টেট' (জৈব রাজ্য) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই জাতীয় ইনস্টিটিউট প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সারা দেশে আর বিশেষত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জৈব কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ভিতকে আরও মজবুত করতে সহায়তা করবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সম্পদের আরও ফলপ্রদ ব্যবহার ও উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মানোন্নয়ন করার জন্যও এই প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব জৈব কৃষি ব্যবস্থাকে সফল ও সুস্থায়ী করতে মৌলিক, কৌশলগত ও অভিযোজিত গবেষণা চালাবে। এর পাশাপাশি, দেশে জৈব কৃষির প্রসার করতে এর মাধ্যমে অংশীদারদের উন্নত মানের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার যথাসময়ে আর্থিক ও মানবসম্পদ আর পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করবে।

'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের আওতায় আরও ৬১ জেলা

কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু বিকাশমন্ত্রক আরও ৬১ জেলাকে (১১ রাজ্যের) 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের আওতায় আনল। এর মধ্যে রয়েছে গুজরাতের ৪ জেলা, হরিয়ানার ৮ জেলা, হিমাচল প্রদেশের ২ জেলা, জম্মু ও কাশ্মীরের ১০ জেলা, মধ্যপ্রদেশের ২ জেলা, মহারাষ্ট্রের ৬ জেলা, দিল্লির ২ জেলা, পাঞ্জাবের ১০ জেলা, রাজস্থানের ৪ জেলা, উত্তরপ্রদেশের ১১ জেলা ও উত্তরাখণ্ডের ৩ জেলা। ভারত সরকারের তিনটে মন্ত্রক—মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক—২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি হরিয়ানার পানিপথে যৌথভাবে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের সূচনা করে। যেসব জেলায় শিশু লিঙ্গ অনুপাত বা চাইল্ড সেক্স রেশিও কম (অর্থাৎ, শূন্য থেকে ছয় বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের মধ্যে প্রতি এক হাজার ছেলের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা) প্রথম পর্যায়ে এমন ১০০ জেলাকে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের আওতায় রাখা হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বিষয়টাকে নিয়ে চিহ্নিত জেলাগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা।

'স্কিল ইন্ডিয়া'-র আওতাধীন প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় ১০ লাখ নথিভুক্তি

কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও অন্ত্রপ্রেনরশিপ মন্ত্রকের অগ্রণী প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় নথিভুক্তির সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম (ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা এনএসডিসি) পরিচালিত এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে ১০১২ স্বীকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। ৩৮২ ধরনের কাজের প্রশিক্ষণ নিতে ১০,২৮,৬৭১ নথিভুক্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। দেশের ২৯ রাজ্য ও ৬ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সব কটা মিলিয়ে মোট ৫৯৬ জেলা ও ৫৩১ নির্বাচনক্ষেত্রকে এই প্রকল্পের আওতায় রাখা হয়েছে। ২৯ ক্ষেত্রে সুদক্ষ কর্মীর চাহিদা মেটাতে ও যুবসম্প্রদায়কে নিয়োগযোগ্য করে তুলতে ৫৬৬ রকমের চিহ্নিত পদের জন্য হাতেকলমে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

রাজ্যগুলোর মধ্যে উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশে আর ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সরবরাহ বা লজিস্টিক্স (১,৩৫,৬১৫), কৃষি (৯০,৪৮৯), ইলেকট্রনিক্স (৮২,৯০৩), শরীর ও রূপচর্চা (৭২,৩১৬), খুচরো বিপণন (৬৫,৯০১) ও অটোমোটিভ বা গাড়িসংক্রান্ত শিল্পে (৬১,৮৪৬) নথিভুক্তির সংখ্যা সব থেকে বেশি।

'লিগো-ইন্ডিয়া' বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের জন্য নীতিগত অনুমোদন

মহাকর্ষ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা 'লেসার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবসার্ভেটরি ইন ইন্ডিয়া' (সংক্ষেপে 'লিগো-ইন্ডিয়া') প্রকল্পের প্রস্তাবকে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। প্রস্তাবিত এই বৈজ্ঞানিক প্রকল্প পরিচালনের দায়িত্বে রয়েছে পারমাণবিক শক্তি দপ্তর আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর। আজ যখন মহাকাশে মহাকর্ষ-তরঙ্গের ঐতিহাসিক আবিষ্কার ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যভেদের জন্য নতুন জানালা খুলে দিয়েছে, ঠিকই সেই সময়েই এল এই গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন।

এই বিশাল বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে ভারতে একটা অত্যাধুনিক মহাকর্ষ-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হবে। এটা গড়ে উঠবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (ক্যালটেক) ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) পরিচালিত লিগো ল্যাবরেটরির (গবেষণাগার) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। 'লিগো-ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা মহাকর্ষ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার এক নতুন দিগন্তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার অভূতপূর্ব সুযোগ পাবেন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিক্ষেত্রের প্রেক্ষিতে বিচার করলেও এই প্রকল্প ভারতের জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনায়। কারণ, 'লেভেলেড টেরেন'-এর ওপর [অর্থাৎ, একেবারে সমতলভাবে—পৃথিবী গোলাকার, তাই প্রকৃত অর্থে এটা সফলভাবে করা বেশ শক্ত] 'আল্ট্রা-হাই ভ্যাকুয়াম (শূন্যস্থান)'-এ ৮ কিলোমিটার লম্বা 'বিম (কিরণ) টিউব (নল)' নির্মাণের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রও যুক্ত থাকবে। আশা করা যায়, এই প্রকল্প ভারতের ছাত্রছাত্রী ও যুবা বৈজ্ঞানিকদের নিত্যনতুন জ্ঞানান্বেষণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং দেশে গবেষণা ও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আরও উদ্দীপনা জোগাবে।

এপ্রিল, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতের পুবে তাকাও নীতি — সঞ্জয় হাজারিকা ৫
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান : ভবিষ্যতের দিশা — ন্যাটালি ওয়েস্ট খারকোঙ্গর ৭
- স্বাস্থ্য ও লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন — অরুণা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী ৯
- প্রগতির ধারায় উত্তর-পূর্ব ভারত : একটি পথের খোঁজ — ড. প্রদীপ্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১১
- উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বর্তমান ত্রিপুরা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা — সপ্তর্ষি মিত্র ও স্তবক রায় ১৮
- উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন শিল্পের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ : কয়েকটা রাজ্যের পর্যালোচনা — রবীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী ২৬
- সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল : আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন — ড. চিন্তামণি রাউত ৩৬
- উত্তর-পূর্ব ভারত : জীববৈচিত্রের এক আশ্চর্য জগৎ — ড. অরূপ কুমার মিশ্র ৩৮
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামোর চালচিত্র — ড. কৃষ্ণ দেব ৪১
- উত্তর-পূর্বাঞ্চল : শক্তিক্ষেত্রের সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা — কে রামনাথন ৪৪
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলপথ — ড. বিশ্বপতি ত্রিবেদী ৪৭
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে দক্ষতা মিশন — সঞ্জীব দুগ্গল ৪৯

বিশেষ নিবন্ধ

- উত্তর-পূর্বাঞ্চল : আদিবাসী জনসংখ্যার সার্বিক বিকাশ কোন পথে? — নরেশ সি সাক্সেনা ৫৩

ফোকাস

- উত্তর-পূর্বের কৃষিকাজ : পরিবেশবান্ধব চাষাবাদের পদ্ধতি দেখিয়েছে সমৃদ্ধির দিশা — নীরেন্দ্র দেব ৫৭

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা ৫৯
- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৬০

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

প্রগতির পথে উত্তর-পূর্বাঞ্চল

সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সাদৃশ্যের প্রতীক হিসেবে তাদের 'সাত বোন' বলে ডাকা হয়। এরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটা রাজ্য—আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ ও মণিপুর এবং সম্প্রতি এই তালিকায় যুক্ত হওয়া সিকিম। আক্ষরিক অর্থে তথা ভৌগোলিকভাবে আমাদের দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাই এই রাজ্যগুলো একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত আছে তিনটে দেশের সীমানা—মায়ানমার, বাংলাদেশ ও অবশ্যই, উঠতি মহাশক্তি চীন। আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ার কারণে এই এলাকার উন্নয়নের গুরুত্ব আরও বেশি বেড়ে যায়।

যদিও সব মঞ্চেই এই রাজ্যগুলোকে একসঙ্গে 'সাত বোন' উপনামে অভিহিত করা হয়, তবুও সব ক্ষেত্রের নিরিখেই বিচার করলে বোঝা যায় যে এই অঞ্চল কত বৈচিত্রময়—এখানকার জাতিগত, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্রের জুড়ি মেলা ভার। একজন বিহারি ও একজন পাঞ্জাবির মতোই একজন অসমীয়া ও একজন নাগা একে অপরের থেকে আলাদা। ঠিক একইভাবে ভিন্ন হল বোড়ো ও গারো সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই অঞ্চলের জনসংখ্যার একটা বড় অংশের মানুষ বিভিন্ন উপজাতির, এদের পরম্পরাগত উপজাতীয় সংস্কৃতির শেকড় অনেক গভীর।

যোজনা

প্রাকৃতিক শোভা ও বিপুল জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ এই অঞ্চল সত্যি পর্যটকের হৃদয় আকৃষ্ট করার মতোই—আসামের জাতীয় উদ্যান থেকে 'মেঘের আলয়' মেঘালয়ের ঝিল ও ঝরনা, কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষরাবৃত্ত চূড়া থেকে সিকিমের মন্যাস্ট্রি (বৌধ মঠ), প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে পরিপূর্ণ এই অঞ্চল। একদিকে রয়েছে এখানকার মনোমোহিনী লোকনৃত্য। অন্যদিকে, এখানে প্রস্তুত হস্তশিল্প ও বস্ত্র সারা দুনিয়ায় জনপ্রিয়।

তবে এই সুন্দর ফুলের মাঝেও আছে পরাল কীট—বিচ্ছিন্নতাবাদ—যা এই অঞ্চলকে উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত করেছে। এখানে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ এতটাই কম যে বছরের পর বছর ধরে এই দুইয়ের সন্ধানে বিপুল সংখ্যক মানুষ দেশের অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, চলছে 'ম্যাসিভ ব্রেন ড্রেন'। আরেকটা বড় সামাজিক সমস্যা হল ড্রাগ—ছেলে থেকে বুড়ো, যে কোনও বয়সের মানুষই নেশার কবলে পড়তে পারেন। কৃষিকাজ এখানকার অন্যতম জীবিকা। এই এলাকা চা, আদা, ফল ও সবজির মূল উৎপাদক। উদ্যানপালনও এখানে বেশ প্রচলিত—এখানকার অর্কিড বিখ্যাত। আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তি না থাকার দরুন কৃষকরা পরিশ্রম অনুযায়ী আয় পায় না। ব্রহ্মপুত্র নদের বিচরণস্থল এই অঞ্চলে, বন্যা আরও একটা বড় সংকট এখানে। পরিকাঠামোর উন্নয়ন এখনও বাকি—মূল ভূখণ্ড থেকে এই অঞ্চলে পৌঁছানোর অন্যতম উপায় হল শিলিগুড়ির রাস্তা ধরে। এই পথ, যার প্রচলিত নাম 'শিলিগুড়ি করিডোর', নানাদিক থেকে ভিন দেশের সীমানাবেষ্টিত।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মানুষের সমৃদ্ধি ও কল্যাণসাধনের জন্য এ সব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে ও এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়াকে অগ্রাধিকার দিতে হবে—তবেই ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ জাতীয় মূলস্রোতের অঙ্গ হিসেবে সারা দেশের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে এগোতে পারবে।❑

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

ভারতের পুবে তাকাও নীতি

ভারতের 'পুবে তাকাও' নীতির প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনার বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান নিবন্ধে। এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশে বেশকিছু সুপারিশও রেখেছেন লেখক অধ্যাপক **সঞ্জয় হাজারিকা।**

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুয়ার উন্মুক্ত করার বিষয়টি বহুচর্চিত। নয়ের দশকের গোড়া থেকে সরকারি স্তরে এ নিয়ে বহু আলোচনা ও সম্মেলন হলেও কাজের কাজ বিশেষ হয়নি। আঞ্চলিক অর্থনীতি উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল বাংলাদেশের সঙ্গে উন্নততর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক।

এর ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল আরও বৃহত্তর ভূমিকা পালন করবে। ঢাকা ঘোষণাপত্র এবং গুয়াহাটিতে প্রধানমন্ত্রী এই কথাই বলেছেন। তার আগে অন্য নেতারাও একই মত পোষণ করেছেন।

তবে ঠিক পূর্ব নয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য তাকাতে হবে দক্ষিণে ও পশ্চিমে। কারণ পূর্বদিকে রয়েছে মায়ানমারের সুদীর্ঘ দেওয়াল। সেখানে এখন সামরিক শাসন থেকে অনিশ্চিত গণতন্ত্রের পথে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছে।

ত্রিপুরায় ব্যবসা-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজ ধীরে ধীরে গতি পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় রাজ্য সরকার বড় ধরনের ইন্টারনেট গেটওয়ে পেয়েছে। আগরতলায় এখন প্রায়শই সীমান্তপারের বাণিজ্য প্রতিনিধিদের দেখা যায়। ছোট্ট এই রাজ্যের ঝিমিয়ে পড়া রাজধানী এখন সরগরম। আরও একটা ইতিবাচক বিষয় হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় শাসনব্যবস্থা অনেক ভালো এবং এখানকার সরকার পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জঙ্গি হামলার বিভীষিকা এখন অতীত। রাজ্যে শান্তি থাকায় ২০১৫ সালে সশস্ত্রবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং উপদ্রুত এলাকা আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ বাগডোগরায় বাণিজ্য দূতাবাস খুলছে। এর ফলে পর্যটকরা দার্জিলিং বেড়াতে যেতে চাইলে তাঁদের আর কলকাতা ঘুরে আসতে হবে না।

আগে বাংলাদেশ যাওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুমোদন জোগাড় করা দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। বাংলাদেশের বাণিজ্য দূতাবাস ছিল কলকাতা ও আগরতলায়। ভিসা পেতে হলে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সেখানে যেতে হত, সময়ও লাগত দু-তিনদিন। যেসব বাংলাদেশিরা এই অঞ্চলে আসতে চাইতেন, তাঁদেরও একইরকম দুর্ভোগ পোয়াতে হত। অবশ্য যাঁরা অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করতেন, তাঁদের কথা আলাদা। দশকের পর দশক ধরে এমন চলার পর অবশেষে সিলেট ও গুয়াহাটিতেও বাণিজ্য দূতাবাস খোলার কাজ চলছে।

এই সব সত্ত্বেও এমন বেশকিছু বিষয় আছে যা অ্যাক্ট ইস্ট নীতি ও যোগাযোগ স্থাপন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এড়িয়ে না গিয়ে এগুলির মোকাবিলা সরাসরিভাবে করা দরকার।

৬০ বছর ধরে সংঘর্ষ ও জঙ্গি হানার ইতিহাস থাকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাবমূর্তি থেকে উপদ্রুত এলাকার ছাপ মুছে ফেলা বেশ কঠিন। এজন্যই সরকারের প্রভূত প্রচার সত্ত্বেও বিনিয়োগকারীরা এখনও এই অঞ্চলে সহজে লগ্নি করতে চান না। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বোধ, বিশ্বাসের অভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নিরাপত্তাবাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এবং তার প্রচার এতে আরও ইন্ধন জোগায়।

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করব, এটা বলা খুব সহজ। কিন্তু আমাদের সীমান্ত যেরকম নিরাপত্তাকেন্দ্রিক ব্যূহের চেহারা নিয়েছে, তাতে এটা হবে কেমন করে?'—২০১৪ সালে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন শিলং টাইমসের সম্পাদক প্যাট্রিসিয়া মুখিম। এ পর্যন্ত এই নীতির সুফল পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী জেলাগুলি, কারণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মূলত সমুদ্রপথেই হয়। সড়ক বা রেলপথে এর পরিমাণ নিতান্তই কম।

দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানকার পরিকাঠামো অনেক দুর্বল। জমি অধিগ্রহণ যে কোনও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক ও সামাজিক বেড়াজালে তাও এখানে জটিল আকার নিয়েছে। মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর মতো উন্নত রাজ্যগুলির সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতিগত ফারাক অনেকটাই।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের ব্যবহার এক বড় পদক্ষেপ হতে পারে। এজন্য আগরতলা থেকে বাংলাদেশের আখাউড়া হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত রেল সংযোগ গড়ে তোলা দরকার। গত দু দশক ধরে এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চললেও কাজের অগ্রগতি সেভাবে হয়নি।

এটি রূপায়িত হলে বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রী ভারতীয় বাজারে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাংলাদেশের বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে অন্যান্য আন্তর্জাতিক বাজারও আসবে নাগালের মধ্যে।

জাতীয় বাঁশ মিশনের আওতায় প্রতি বছর ২ কোটি টন বাঁশ উৎপাদন করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ পেতে পারেন। কিন্তু এ নিয়ে তৃণমূল স্তরে তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। দাড়ি কামানোর ব্লেড থেকে শুরু করে মাছ, পেন্সিল, খাদ্যশস্য, গাড়ি, টেলিভিশন—এই অঞ্চলে সবই আমদানি করতে হয়। এই অঞ্চল কেবল বাজার হিসাবেই থেকে গেছে, উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়নি। এখানকার ফল, শাকসবজি এমনকী গৃহপালিত পশু বাংলাদেশ ও মায়ানমারে রপ্তানি করা হয়, অথচ পণ্যসামগ্রীর উন্নয়নে কোনও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি।

এখানকার মানবোন্নয়ন সূচকগুলির জটিলতাও আর এক ধরনের চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী আসামে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি—৩০০। এই হার উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা মধ্যপ্রদেশের থেকে অনেক বেশি। ২০০৫-০৬ সালে এই হার ছিল ৪৯০ (প্রতি ১ লক্ষ প্রসবে)। সেই সময়ের থেকে অবশ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। প্রসবকালীন মৃত্যুহার কমানোর বিষয়টি মানবিক মর্যাদা ও সাম্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। এই হার না কমলে পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণ—কোনও দিকে তাকিয়েই লাভ নেই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির প্রাথমিক লক্ষ্যও হল প্রসূতিমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এই অঞ্চলেও পড়েছে। প্রতি বছর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বন্যায় ভেসে যায়। সম্প্রতি এমনই এক বন্যায় সাড়ে তিনশো বাঁধ ভেঙে গেছে। তবুও উত্তর-পূর্বাঞ্চল বা দেশের অন্য কোথাও বাঁধগুলির মজবুতি নিয়ে বিতর্ক তেমন চোখে পড়ে না। কথা হয় না এর বিকল্প অনুসন্ধান নিয়েও।

অ্যাক্ট ইস্ট বা পুবে তাকাও নীতি প্রশংসনীয় হলেও একটি মূল বিষয় এর নজর এড়িয়ে গেছে। নদীতে পণ্য পরিবহণের জন্য জল পরিবহণ নীতি প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক। এছাড়া এই অঞ্চলের প্রধান সড়ক ও রেলপথগুলি বছরে তিন থেকে পাঁচ মাস বন্যাপ্লাবিত থাকে। তাই নীতি প্রণয়ন ও রূপায়ণের প্রতিটি স্তরে বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ জরুরি।

কিন্তু এর মাধ্যমে নদীর ধারে বাস করা জনগোষ্ঠীর সহায়তা কীভাবে করা যায়? নদীতে জলযানের চলাচল বাড়লে তা মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপরই বা কী প্রভাব ফেলবে?

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলির ওপর বৃহৎ পরিকাঠামো গড়ে উঠলে তার প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা হয়েছে। জলজ জীবন, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, জলনির্ভর কৃষিকাজ ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাব খতিয়ে দেখা দরকার। দক্ষিণ এশিয়ার বিলুপ্তপ্রায় ডলফিনেরই বা কী হবে? এখন আর মাত্র ৪০০টি ডলফিন বেঁচে রয়েছে।

এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যাতে সহজেই অনেক কিছু করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, মিডিয়া, হস্তশিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে বিনিময় বাড়ালে এই অঞ্চলের নাগরিকদের সংযোগ সুদৃঢ় হবে। এই প্রয়াসে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সহায়তাও প্রয়োজন।

এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব মেটানোর দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াসের পাশাপাশি একে পর্যটন ও ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে (এখানে যেরকম বন্‌ধ ও ধর্মঘট চলে, তাতে কোনও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীই এখানে ব্যবসা স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ দেখায় না।)।

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগোলে এই অঞ্চলের তরুণতর প্রজন্ম উৎসাহ পাবে। শান্তি, মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এজন্য অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মতভেদ কাটিয়ে উঠে বাস্তব পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। জোর দিতে হবে উন্নয়ন ও বিকাশের ওপর।❑

[লেখক জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর নর্থ-ইস্ট স্টাডিজ অ্যান্ড পলিসি রিসার্চের অধ্যাপক এবং অধিকর্তা। উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীহাজারিকা এখানকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওলার লক্ষ্যে বোট ক্লিনিকের উদ্ভাবক।
email : sanjoyha@gmail.com]

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান
ভবিষ্যতের দিশা

ভৌগোলিক অবস্থান ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনায় প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এখনও পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বিশেষ না থাকায় এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের অন্যত্র যেতে হয়। এই অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি এবং তা থেকে উত্তরণের দিশা এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন লেখক **ন্যাটালি ওয়েস্ট খারকোঙ্গর।**

২০১১ সালের মার্চের হিসাব অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যে সাক্ষরতার হার ৭৭.৭৬ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ৭৪.০৪ শতাংশের থেকে বেশি। কিন্তু সাক্ষরতার এই উচ্চতর হার সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা অসংগঠিত এবং বহু সীমাবদ্ধতায় আকীর্ণ। বিশেষত কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অঞ্চল পিছিয়ে থাকায় বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে যেতে হয়। এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা, যার মূল নিয়ন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলি, জাতীয় স্তরের সমমানে নয়। রাজ্যগুলি এখনও শিক্ষা প্রদানের প্রথাগত মাধ্যমগুলিই আঁকড়ে রয়েছে। ছকে বাঁধা এই শিক্ষা কাঠামোর জন্য শুধু যে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীকে অঞ্চলের বাইরে যেতে হয় তাই নয়, বাড়ে স্কুলছুটের হারও। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এখানে স্কুলছুটের হার ৫০.০৫ শতাংশ, যা জাতীয় গড় ৪০.৮ শতাংশের থেকে অনেকটাই বেশি।

কেতাবি শিক্ষা ও তার বাস্তব প্রয়োগের অভাব ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে, বাড়ছে বেকারত্ব। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেও বহু ছাত্র-ছাত্রী বেকার অথবা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাননি। দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ এবং পেশাদার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম। শিক্ষা কাঠামোর এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ছাড়াও রয়েছে স্থানীয় স্তরে বন্‌ধ ও ধর্মঘটের সমস্যা। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে বছরে একশো দিনও ক্লাস হয় না। এ জন্য অনেক অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের বাইরে পড়াশোনা করতে পাঠাতে বাধ্য হন। অনেক সময়ে এর সুযোগ নিয়ে শিশুপাচারের মতো ঘটনাও ঘটে। সেই জন্যই সুপ্রিম কোর্ট মণিপুরের ১২ বছরের কম বয়সের শিশুদের রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

অপ্রতুল শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যাবার প্রবণতার আরেকটি কারণ হল জঙ্গি উপদ্রব। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যকেই এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অসমে ULFA, কার্বি-আঙ্গলঙ্গ দ্বন্দ্ব, নাগাল্যান্ডে নাগালিম সমস্যা ও নাগা-কুকি দ্বন্দ্ব, অরুণাচল প্রদেশে চাকমা হেজঙ্গ ও অরুণাচলীদের দ্বন্দ্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ভূমিপুত্র বনাম বহিরাগতের সমস্যা এর কয়েকটি নিদর্শন। এ ছাড়া আন্তঃসীমান্ত পাচার, উগ্রপন্থা এবং সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। গত কয়েক দশক ধরেই এই অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত। এর জেরে যত্রতত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা উগ্রপন্থীগোষ্ঠী, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, ঘনঘন ধর্মঘট, সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের প্রয়োগ এবং সরকারি শাসনব্যবস্থার দুর্নীতিপ্রবণতা সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই অঞ্চলের কিছু এলাকায় বছরে ১০০ দিনই বন্‌ধ ডাকা হয়, স্কুল-বাজার-দোকানপাট বন্ধ থাকে, গণ পরিবহণ রাস্তায় নামে না, দিনে দু ঘণ্টাও বিদ্যুৎ থাকে না, সপ্তাহে দু-একবার জল সরবরাহ করা হয়—সব মিলিয়ে জীবন এক দুঃস্বপ্নের চেহারা নেয়। সাধারণ দিনেও সেখানে বিকেল চারটের মধ্যে দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, সন্ধে আটটার পর রাস্তায় লোক বেরোয় না। সেই সময়ে টহলদারি পুলিশ যে কোনও কাউকে তুলে নিয়ে যেতে বা হেনস্থা করতে পারে। জঙ্গিরা অপহরণ বা হত্যা করলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বছরের পর বছর ধরে এমন অশান্তি চলা সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষজন তাঁদের নিজেদের গ্রাম ও শহরে থাকাই পছন্দ করতেন। কিন্তু বিশ্বায়নের পর এর সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে এখানকার যুব সম্প্রদায় কাজের সন্ধানে বাইরে যাচ্ছে। মূলত BPO, শপিং মল এবং আপ্যায়ন শিল্পে তাদের কাজের সুযোগ মেলে।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও সন্ত্রাসের কবলে পড়ে এখানকার শত শত গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে, প্রাণ হারিয়েছেন অজস্র মানুষ, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে গৃহহীন ও অনাথের সংখ্যা। অনেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছেন দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোরের মতো বড় শহরে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যেসব রাজ্যে ছোট-বড় নদী আছে, তাদের আর এক সমস্যা

বন্যা। পরিবহণ ও যোগাযোগের সমস্যা তো রয়েইছে। বিদ্যুৎ, ইন্টারনেটের মতো আধুনিক সুবিধাও এখানে অপ্রতুল। এখানকার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিও পৌঁছতে পারে না। মুদ্রিত ও বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে এই অঞ্চলের খবর প্রায় থাকে না বললেই চলে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছেড়ে দেশের অন্যত্র প্রব্রজন বন্ধ করতে হলে সবার আগে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সংখ্যার থেকে মানের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিল্প স্থাপনের মানসিকতা গড়ে তোলার মতো কাজগুলি যে কোনও উন্নত রাজ্যে করা হয়। এখানেও সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। সংস্থাগুলিকেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গ হিসাবে তারা এখানে কারিগরি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে।

মেক ইন ইন্ডিয়া ও স্টার্ট আপ মডেলের সুযোগ নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে চাইলে রাজ্যগুলিকে অবশ্যই কাজের ভবিষ্যৎ চাহিদা (প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও পরিষেবা ক্ষেত্র, খনিজ, বন, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, জল, মৎস্যচাষ, পর্যটন প্রভৃতি) এবং ভবিষ্যৎ জোগান সম্পর্কিত তথ্য প্রস্তুত করে রাখতে হবে। জোগানের বিষয়টি আবার নির্ভর করে পাঠ্যসূচির ওপর। (এর মধ্যে রয়েছে তুলনামূলক সুবিধা, শিক্ষকদের কাজের মান, প্রশিক্ষণের জন্য উদ্ভাবনী যন্ত্রপাতি, দক্ষতা প্রভৃতি।)

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি যেসব সুবিধা ভোগ করে তা হল—ইংরাজি ভাষাভাষী বিপুল জনগোষ্ঠী, ছাত্রদের সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা এবং সাক্ষরতার উচ্চহার। এখন আর সমীক্ষা নয়, কাজের প্রয়োজন। বহু বছর ধরে নানা সংস্থা কেবল একের পর এক সমীক্ষা, সম্মেলন, কর্মশালা, আলোচনাচক্রেরই আয়োজন করে গেছে। সম্পদের অপচয় হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। এখন আমাদের প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিশ্বের শিক্ষা ও পর্যটন হাবে পরিণত করতে হলে সরকারি দপ্তরগুলি, ICC, FICCI, FINER এবং নাগরিক সমাজকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। পর্যটনের উন্নয়নে বহুমাত্রিক দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এমন পরিকাঠামো নির্মাণ করতে হবে যা পর্যটনস্থলগুলিকে যুক্ত করবে। YHA-র মতো ট্রেকিং সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দিতে হবে ট্রেকিং-এর প্রসারে, পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগ করতে হবে পেশাদারদের। এ জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি পৃথক পর্যটন নীতি প্রণয়ন করা দরকার। এই অঞ্চলকে গোয়া ও কেরালার সঙ্গে এক সারিতে নিয়ে আসতে হবে।

এখানকার অবস্থানগত সুবিধার সদ্ব্যবহারে গোষ্ঠীভিত্তিক সমান্তরাল ঋণদান ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এই অঞ্চল পূর্বের প্রধান রাজ্যগুলি এবং প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সংলগ্ন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার। আর্থিক সংস্থাগুলি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ব্যাংকিং লেনদেনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনৈতিক সুবিধাকে কাজে লাগাতে বিশেষত চা, কফি, সুগন্ধী দ্রব্য, ওষধি এবং উদ্যানজাত দ্রব্যের জন্য এখানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করা যেতে পারে। এর সঙ্গে থাকতে হবে উচ্চমানের গবেষণার সুযোগ, যা চাহিদাচালিত প্রযুক্তি তৈরি করতে পারবে। IIM শিলং-এর মতো বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গড়ে তুলতে হবে জোগান শৃঙ্খল মডেল।

সর্বোপরি প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, আমলাতান্ত্রিক সহায়তা ও দায়বদ্ধতা, সুশাসন, ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। সর্বশক্তি নিয়োগ করে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জঙ্গি সমস্যার সমাধান করতে পারলে তবেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে বহির্মুখী অভিবাসনের স্রোত থামবে।❑

[লেখক আইআইএম (শিলং)-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন কেন্দ্র (CEDNER)-এর চেয়ারপার্সন ও অর্থনীতি বিষয়ক সহযোগী অধ্যাপক।
email : nwk@iimshillong.in]

উল্লেখপঞ্জি :

Bogue, D.I. (1971), Internal Migration in O.D. Duncan and P.M. Houser (ed.), The Study of Population : An Inventory and Appraisal, Chicago University Press, Chicago

Chandra, Madhu (2010), North East Migration and Challenges in North East Mega Cities.

Gosal, G.S. (1961) Internal Migration in India : A Regional Analysis, Indian Geographical Journal Vol. 36, Pp. 106-121.

Mandal, R.B. (ed.) (1981), Frontiers in Migration Analysis, Concept Publishing Company, New Delhi, p. 25.

Peterson, W.A. (1958), General Typology of Migration, Sociological Review, No. 23.

Sabjib Baruah (2005), Durable Dispoder : Understanding the Politics of Northeast India, OUP.

Singh, Mahavir (ed.) (2005), Home Away From Home : Inland Movement of People in India Anamika Publisher and distributors (p) Ltd. (MAKAIAS), p. 11.

Trewartha, G.T. (1969) A Geography of Population : World Patterns, John Wiley and Son, Inc., New York.

(Author : Dr. Natalie West Kharkongor, Associate Professor & Chairperson, CEDNER, IIM Shillong)

স্বাস্থ্য ও লিঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর-পূর্বের উন্নয়ন

উন্নয়ন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনায় উন্নতির বিভিন্ন মাত্রা, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাবৎ মূল উপাদান, উৎপত্তি এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে এসবের প্রভাব নিয়ে এক সম্যক ধারণা থাকা জরুরি। সত্যিই, এ এক জটিল বিষয়। এজন্য ঠিক সময় ও ঠিক জায়গায় পরিকল্পনামাফিক ঠিক জিনিস পাওয়ার জন্য দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি থাকা দরকার। লিখছেন **অরুণা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী।**

ভারতের জনসংখ্যায় যুবাদের ভাগ বেশি। এহেন দেশে উন্নয়নের মাপকাঠির মূল উপাদান হচ্ছে শিক্ষা আর স্বাস্থ্য। দীর্ঘমেয়াদে, তাই, এই দুক্ষেত্রের দিকে লক্ষ রাখা চাই। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথাতেও শোনা যায় এরই প্রতিধ্বনি 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন টিকিয়ে রাখতে শিক্ষিত, সুস্থসবল কর্মীবহর না হলেই নয়।' দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে চাইলে ভারতকে তরুণদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করতে উপযুক্ত লগ্নি করতে হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নজর

তাত্ত্বিক দিক থেকে উত্তর-পূর্বে উন্নয়নের বিভিন্ন মাত্রার সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের কোনও ভেদ নেই। তা সত্ত্বেও, উত্তর-পূর্বের দিকে আমরা মনোযোগ ফেরালে এই আলোচনা এক বিশেষ মোড় নেবে।

অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা এই সাতটি রাজ্য নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল। ভুটান, চীন, মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া এক জটিল ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলে এর অবস্থান। দুই হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত এই এলাকার সঙ্গে বাদবাকি ভারতকে যুক্ত করেছে মাত্র কুড়ি কিলোমিটার চওড়া এক ভূখণ্ড।

দেশের অন্যতম নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত বৈচিত্রপূর্ণ অঞ্চল এই উত্তর-পূর্ব। এই অঞ্চলের রাজ্যে রাজ্যে দেখা যায় স্বতন্ত্র কৃষ্টি, স্বতন্ত্র পরম্পরা-ঐতিহ্য। এখানে ঘরবসত করে ১৬৬টির বেশি জাতিগোষ্ঠী। আর এদের কতরকম না ভাষা। নিসর্গের উচ্ছল শ্যামলিমা, ভৌগোলিক ও বাস্তুসংস্থানের বৈচিত্রের দরুন উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল অনেকখানি ভিন কিসিমের। অবস্থান, মানুষজন, ভাষার বৈচিত্র, সেইসঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই ভূখণ্ডকে সবিশেষ করে তুলেছে। আর ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পৃথকও। এই স্বাতন্ত্র্য এখানকার উন্নয়নের এক বাধাও বটে। সর্বভারতীয়তা বা প্যান ইন্ডিয়া ভাবধারার পক্ষেও এ এক কাঁটা।

কিসে ভুগছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল?

উত্তর-পূর্বে ঢিমেতালে উন্নয়নের জন্য এখানকার দুর্গমতার দিকে বরাবরই আঙুল তোলা হয়েছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে এর আরও কিছু হেতু। এই অঞ্চল ও তার বাইরের থেকে চাগানো সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে উত্তর-পূর্বে লগ্নির প্রস্তাব শিল্পমহলের কাছে কলকে পায় না। ফলে পরিকাঠামোর হালও তথৈবচ। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে পরিকাঠামোর সুযোগ-সুবিধে থাকা কিন্তু এক প্রাক্ শর্ত।

উত্তর-পূর্বে উন্নয়নের জন্য সদর্থক পদক্ষেপ করতে রাজনৈতিক উদাসীনতাহেতু পরিকাঠামোয় ঘাটতি আছে। ফলে উৎকর্ষ পিছু হঠেছে। বাড়বাড়ন্ত মাঝারিয়ানা বা মধ্যমেধার। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির গাছাড়া ভাবের দরুন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বেহাল। দুর্নীতি ব্যাপক। অবহেলিত সামাজিক ন্যায়। জনসাধারণ বিশেষত যুবাদের মনে এহেন অবস্থা এক নঞর্থক প্রভাব ফেলে। সাহিত্যে নোবেলজয়ী পার্ল এস. বাকের কথায় 'যুবারা বিচক্ষণ হতে খুব বেশি একটা জানে না। আর তাই তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম অসম্ভবকে ধরার জন্য ধাওয়া করে।'

অঞ্চলে ড্রাগের রমরমা

উত্তর-পূর্বাঞ্চল আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেরা। এই সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধ যাতায়াত বন্ধ করা চাট্টিখানি কথা নয়। তায় আবার নাকের ডগায় কুখ্যাত 'সোনালি চতুর্ভুজ'। ড্রাগের ছোবলে দেশের অবশিষ্ট অংশের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষতি হয়েছে তাই সবচেয়ে বেশি। এই পরিস্থিতি চলছে এখনও। ইদানিং কয়েক বছর, ড্রাগ ইনজেকশন নেওয়াদের এইচআইভি সবচেয়ে বেশি থাকার দরুন এরা হাই-রিস্ক গ্রুপের মধ্যে পড়ছে। ড্রাগের বিষয়টি বহু কিছুর সঙ্গে জড়িত। ড্রাগ চক্রের লোকজন অনেক সময় যৌন ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত থাকে। ড্রাগের ধরন, ড্রাগ জোগাড় ও ড্রাগ আসক্তির ক্ষতি কমানো সম্পর্কে সচেতনা থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনি

বাধাবিপত্তির পারস্পরিক সম্পর্ক—এসবই ড্রাগ নেশাড়ুদের জীবনে প্রভাব ফেলে। ভারতে ড্রাগ ইনজেকশন নিয়ে থাকে ১ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি মানুষ। সংক্রমণের পরোয়া না করে একই ছুঁচ ও সিরিঞ্জ থেকে ড্রাগ নিতে এদের হেলদোল কম। এসব নেশাড়ুদের একটা বড় অংশই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। এছাড়া বেলাগাম যৌন আচরণের দরুনও এদের জীবন ঝুঁকিবহুল। এসবের ফলে এইচআইভি ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

লিঙ্গ, ড্রাগ ও স্বাস্থ্য

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো, বিশেষত সমাজে মেয়েদের অবস্থান বা মর্যাদার দরুন ড্রাগ ব্যবহারজনিত সমস্যার মোকাবিলা করাটা মহিলাদের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ। নিজের জন্য নিরাপদ যৌনতা নিশ্চিত করাটা মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। কেননা, সমাজে পুরুষের ক্ষমতা বেশি। তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছেটাই চাপিয়ে দেওয়া হয় মেয়েদের উপর। অনিরাপদ যৌনতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মেয়েরা প্রায় নিরুপায়। যৌনরোগ/এইচআইভি এবং গর্ভাবস্থা ও প্রসবোত্তর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

ড্রাগ ইনজেকশন নেওয়া মহিলা এবং নারী যৌন কর্মীদের তো বাড়তি ভোগান্তি। মেয়ে বলে বাড়তি কলঙ্ক, অপবাদ এবং বৈষম্য যেন এদের বিধিলিপি। সমাজে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ড্রাগ ব্যবহারের ক্ষতি কমাতে হলে ড্রাগ ইনজেকশন নেওয়া মহিলাদের ইস্যুগুলি নিয়েও সমাজ, পরিষেবা প্রদানকারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষকে সচেতন করতে হবে।

হাল ফেরানোর উপায়

ড্রাগ নেওয়া, ড্রাগ ইনজেকশনে আসক্ত ও যৌন কর্মীদের চিকিৎসা মেলা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা দরকার। এ ব্যাপারে আলোচনা মঞ্চের মাধ্যমেও জনমত গড়ে তুলতে হবে।

ডাক্তারি, মানসিক ও সামাজিক ইস্যু সমাধানের মাধ্যমে ড্রাগ ইনজেকশন নেওয়ার ক্ষতি কমানোর জন্য বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজন। অন্যান্য আচরণের মতোই, ড্রাগ ইনজেকশন নেওয়াদের ক্ষেত্রেও এক সামগ্রিক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা দরকার। একটা মানুষ কেন ড্রাগের নেশা করছে। নিরাপদ থাকার উপায়-সুপায়। ভালোমন্দের নীতিকথা আওড়ানো নয়—ড্রাগ আসক্তদের ক্ষতি কমানোর জন্য তাদের পাশে দাঁড়ানো। সমাজ ও পরিবারকে সংবেদনশীল হয়ে নেশাড়ুদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

ড্রাগ ইনজেকশনের জন্য ক্ষতি কমানোর কর্মসূচিতে প্রায়শই 'রিঅ্যাকটিভ' ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়। ড্রাগের নেশা ও তার কুফলের হরেক দিক বিচার করলে দেখা যাবে নিরাময়ের চেয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা বেশি কাজের।

ড্রাগে হাতেখড়ি হয় সচরাচর কৈশোর ও যৌবনে। কিশোর-কিশোরী ও যুবারা যাতে ড্রাগের ফাঁদে না পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ড্রাগাসক্তদের পরিবারে। কেননা এসব বাড়ির ছেলেমেয়েরা ড্রাগ ইনজেকশন নেওয়া শুরু করার দিকে সহজেই পা বাড়াতে পারে।

পরিশেষ

উত্তর-পূর্বের উন্নয়নের জন্য জোরালো রাজনৈতিক সমর্থন ও অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন আলাপ-আলোচনা চালানো দরকার। অংশগ্রহণ ক্ষমতা তৈরি করে এবং এক সক্ষম জনগণ উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি।❑

[লেখক সহযোগী অধ্যাপক, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেল্‌থ (দিল্লি), পাবলিক হেল্‌থ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া।]

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

প্রগতির ধারায় উত্তর-পূর্ব ভারত

একটি পথের খোঁজ

উত্তর-পূর্বের আটটা রাজ্যই সম্পদ-সমৃদ্ধ—প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে মানবসম্পদ, বৈচিত্রপূর্ণ এই সম্ভারের জুড়ি মেলা ভার। এই অঞ্চলের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে যেসব নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর সাফল্য নিয়ে আশাবাদী **ড. প্রদীপ্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।** *এই নিবন্ধে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভবিষ্যতের রূপরেখার সামগ্রিক চিত্রটা তুলে ধরেছেন।*

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যে চারটি দশক পেরিয়ে গেল, তার দিকে পিছন ফিরে তাকালে, যে ছবি মনে ভেসে আসে তা এক কথায়, এক গতিশীল পরিবর্তনের উজ্জ্বল মুখ—নানা চড়াই-উতরাই-এর মধ্যেও অমিত সম্ভাবনার দিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক অসম ও সিকিম সফরে এই বিশেষ চিত্রটি ফুঠে উঠেছে। অসমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন। একটি ব্রহ্মপুত্র ক্র্যাকার ও পলিমার লিমিটেড। অপরটি নুমালিগড় রিফাইনারিজ লিমিটেড। ডিব্রুগড়ের কাছে অবস্থিত এই দুটি প্রকল্প দুটি ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। প্রাকৃতিক সস্তা কাঁচা পদার্থের মূল্য সংযোজন (value addition) করবে আর বিশেষ করে অসমের যুবসমাজের জন্য অজস্র কর্মসংস্থানের সুযোগ আনবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এই দুটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কর্মসুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও এই আধুনিক প্রযুক্তি অতিরিক্ত ব্যয়ের মাত্রা হ্রাস বা cost over-runs কমাতে সাহায্য করবে। স্থগিত থাকা বা অগ্রসর না হওয়া প্রকল্পগুলির সত্বর পুনর্জীবন ও রূপায়ণ দেশের সার্বিক উন্নয়নের পক্ষে জরুরি। পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে পূর্বোত্তর ভারতে উন্নয়নের গতি জাতিকেই সমৃদ্ধ করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন উদ্যোগ—মুদ্রা (MUDRA) ও স্টার্ট আপ প্রকল্প উন্নয়নের দিশায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

এর পাশাপাশি অপর চিত্রটি সিকিমে। উপলক্ষ্য বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীদের সম্মেলন। বিষয় দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন। জৈব কৃষি ও পরিবেশ পর্যটনের সুযোগ সৃষ্টি। সিকিমকে প্রথম জৈব কৃষি ও প্রযুক্তির রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হল। জৈব কৃষিতে সিকিম যেভাবে তার কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত করছে, তাতে সমগ্র দেশে একটি নতুন দিশা দেখিয়েছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। জৈব পদ্ধতিতে উৎপন্ন শাক-সবজি ও ফলের এক অনবদ্য প্রদর্শনী এবং এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কৃষকদের পারদর্শিতা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা প্রশংসনীয়।

মানবসম্পদের ক্ষেত্রেও পূর্বোত্তর ভারতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। এর সদর্থক ইঙ্গিত রয়েছে এই অঞ্চলে অনেক মহা-বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্যে। প্রধানমন্ত্রী গুয়াহাটিতে আইআইটি-র নতুন ভবনের শিলান্যাস করলেন এবং আইআইটি, এনআইটি ও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশে ভাষণও দিলেন।

আর একটি চমকপ্রদ তথ্য এই অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতি ও সমাজসচেতনতাকে উজ্জ্বলতর করেছে, তার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। মেঘালয়ে রয়েছে এশিয়ার পরিচ্ছন্নতম গ্রাম। শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে পিনুরস্লা (Pynursla) সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অধীনে মাওলিননং (Mawlynnong) গ্রাম। প্রত্যক্ষদর্শীরা ছবির মতো এই পাহাড়ি গ্রামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যায়। খাসি সম্প্রদায়ভুক্ত পাঁচশো অধিবাসী সকলেই সাক্ষর। কৃষি এদের প্রধান জীবিকা এবং সুপারি চাষই প্রধান। সবুজ গাছ-গাছালি, রকমারি ফুলের বাহার, সুন্দর সাজানো বাড়ি, পিচঢালা আঁকাবাঁকা ছিমছাম রাস্তা এই গ্রামকে অনন্যসুন্দর এলাকায় পর্যবসিত করেছে—একটি যথার্থ আদর্শ স্বচ্ছ গ্রাম। এর সামাজিক ঐতিহ্য মাতৃ-পরম্পরায় লালিত (matrilineal society)। বস্তুত বহুপূর্বেই নির্মল ভারত অভিযানের কর্মসূচির অধীনে ২০০৭ সালে প্রতিটি ঘরে শৌচালয় নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাঁশের তৈরি ঝুড়ি বা ডাস্টবিন বর্জ্য পদার্থ ফেলার জন্য রাখা আছে। এসবেরেই ফলশ্রুতি এশিয়ার স্বচ্ছতম গ্রামের তকমা।

স্বাধীনোত্তর যুগে পূর্বোত্তর ভারতের জটিল সমস্যা সমাধানে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংবিধানে ষষ্ঠ তপশিলের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে রাজ্য পুনর্গঠন ১৯৭২, নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল গঠন এবং পূর্বোত্তর ভারতের জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয়মন্ত্রক স্থাপন—সব মিলিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার ফলে এক ব্যাপক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গেছে। অবশ্যই অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। যে ছবিগুলি দিয়ে এ প্রবন্ধের শুরু, তাতে এই নীরব বিপ্লবই সূচিত হয়েছে।

সারণি-১ থেকে এ চিত্রটি পরিষ্কার হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভাগ অনুযায়ী নিযুক্ত কর্মীদের সংখ্যা—পূর্বোত্তর ভারতের আটটি রাজ্যের চিত্র সারণি-২-এ দেওয়া হল।

এই যে চিত্র পাওয়া গেল, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি ও উত্তর-পূর্ব কাউন্সিলের দীর্ঘদিনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই প্রতিফলিত।

অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও অন্যান্য বহুবিধ ক্ষেত্রে একদা অতি অনগ্রসর রাজ্যগুলি

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেদের ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করছে। যেমন, ক্রীড়াক্ষেত্র— ফুটবলে মেঘালয় ও মিজোরাম, বক্সিং-এ মণিপুর। মিজোরামের ফুটবল টিম ২০১৪ সালে সন্তোষ ট্রফি-তে চ্যাম্পিয়ন হয়। ন্যাশনাল গেমস, আই লিগ প্রভৃতিতে আইজল এফসি ক্লাবের সাফল্য উৎসাহজনক। লালিয়ানজুয়ালা চাংতে-র 'বিস্ময়বালক' হিসাবে উত্থান লক্ষণীয়। প্রখ্যাত লেখক মেজার ম্যাক্কল যাকে 'Lushai Chrysalis' বলেছেন তা আজ যেন পরিপূর্ণ প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

আটটি রাজ্যেই সড়কপথের সম্প্রসারণ ও উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি, যেমন, মায়ানমার, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অনেক হাইওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনার ফলে এই অঞ্চলে আর্থিক ও বাণিজ্যিক উন্নতির নতুন দিগন্ত খুলবে। স্পষ্ট মনে পড়ে, অসমের দিসপুর থেকে যাত্রা শুরু করে মেঘালয়, বরাক উপত্যকা পেরিয়ে মিজোরামে সুদূর দক্ষিণে লংটলাই-লুশাই, লাইজো, মারা, চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল ঘুরে সাইহা যাবার পথে সেই বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে ছিমতুইপুই নদী বাঁশের ফেরিতে অতিক্রম করতে হয়েছে। আজ ওই নদীর উপর দুপারের সংযোগসেতু নির্মাণ হয়েছে। দুর্গম জায়গাগুলি আজ ভ্রমণ-পিপাসুদের পক্ষে সহজতর ও হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এই চিত্র অনেক জায়গায়, তা সে চামফাই ছাড়িয়ে সুন্দর 'রি দিল' হ্রদই হোক বা অরুণাচলের কোনও দূরবর্তী বরফে ঢাকা পাহাড়ি এলাকা বা তাওয়াং-এর বৌদ্ধমঠই হোক।

এই ধারাকে আরও বেগবতী করতে বিগত ১৫ জুলাই, ২০১৫-তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। দ্রুত ও স্থায়ী উন্নয়নে পরিকাঠামো নির্মাণের উপর বেশ জোর দেওয়া হয়। SARDPNE (Special Accelerated Road Development Programme for the North-East) কর্মসূচিতে ৩৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

সারণি-১
এক ঝলকে উত্তর-পূর্ব ভারত

রাজ্য	মোট জনসংখ্যা (জনগণনা ২০১১)	জনঘনত্ব	সাক্ষরতার হার (শতকরা)	রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (বর্তমান মূল্যে) লক্ষ টাকায়
অরুণাচল প্রদেশ	১৩,৮২,৬১১	১৭	৬৫.৩৮	১৩,৪৯,১০৩
অসম	৩,১১,৬৯,২৭২	৩৯৮	৭২.১৯	১,৬২,৬৫,২২৪
মণিপুর	২৭,২১,৭৫৬	১১৫	৭৯.২১	১২,৪৮,৪২৩
মেঘালয়	২৯,৬৪,০০৭	১৩২	৭৪.৪৩	২১,০৪,৪৬০
মিজোরাম	১০,৯১,০১৪	৫২	৯১.৩৩	৮,৩৬,২৯২
নাগাল্যান্ড	১৯,৮০,৬০২	১১৯	৭৯.৫৫	১৭,৭৪,৯৩২
সিকিম	৬,০৭,৬৮৮	৮৬	৮১.৪২	১২,৩৭,৬৬৯
ত্রিপুরা	৩৬,৭১,০৩২	৩৫০	৮৭.২২	২৩,৮৫,৪৭০

সূত্র : Basic Statistics of North-Eastern Region 2015, North-Eastern Council Secretariat, Shillong.

সারণি-২

রাজ্য	চাষে নিযুক্ত	কৃষি মজুর	ছোট শিল্পে নিযুক্ত	অন্যান্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত
অরুণাচল প্রদেশ	৩,০২,৭২৩	৩৬,১৭১	৮,৩৬৫	২,৪০,৩৯৮
অসম	৪০,৬১,৬২৭	১৮,৪৫,৩৪৬	৪,৯১,৩২১	৫৫,৭১,৩৯৬
মণিপুর	৪,৫৭,৮৯১	১,১১,০৬১	৮৯,৪৯৫	৫,০০,৬০৬
মেঘালয়	৪,৯৪,৬৭৫	১,৯৮,৩৬৪	২০,৪৮৮	৪,৭২,০৯২
মিজোরাম	২,২৯,৬০৩	৪১,৭৮৭	৭,৮৫২	২,০৭,৪৬৩
নাগাল্যান্ড	৫,৩৭,৭০২	৬২,৯৬২	২২,৮৩৮	৩,৫০,৬২০
সিকিম	১,১৭,৪০১	২৫,৯৮৬	৫,১৪৩	১,৫৯,৬০৮
ত্রিপুরা	২,৯৫,৯৪৭	৩,৫৩,৬১৮	৪১,৪৯৬	৭,৭৮,৪৬০

সূত্র : Basic Statistics of North-Eastern Region 2015, North-Eastern Council Secretariat, Shillong.

করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মাধ্যমে Trans-Arunachal Highway উন্নত করা হবে এবং দুই লেকের হাইওয়ে নির্মাণ করে এই অঞ্চলের সমস্ত জেলা সদর শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হবে। এতে প্রায় ৬,৪০০ কিলোমিটার সড়ক তৈরি হবে। রেলপথ নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে বর্তমান রেলপথের উন্নতিসাধন, ব্রডগেজ-এ রূপান্তর-সহ নতুন পথ নির্মাণের জন্য সাতান্ন হাজার কোটি টাকার বাজেট সংস্থান ধাপে ধাপে রাখা হবে।

'পুবে কাজ কর' নীতির অধীনে রেল, সড়ক, বিমানপথ ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব রকম যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্য বিদ্যুৎ, অসামরিক উড়ান, টেলিকমিউনিকেশন এবং জাহাজমন্ত্রকের তরফ থেকে নানা উদ্যোগ ও তার জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ওই বৈঠকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নীতি আয়োগের নির্ণয় অনুসারে রাজ্যগুলির মুখ্য সচিবদের নিয়ে গঠিত বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি (empowered committee) উপরি-উক্ত পরিকাঠামো নির্মাণের প্রকল্পগুলির যথাযথ বাস্তবায়নের বিষয়ে তদারকি ও মনিটারিং করবে। রূপায়ণের পথে সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হবে, যাতে বিলম্বজনিত ও অন্যান্য কারণে ব্যয় বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আশা করা যায়,

এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে এই অঞ্চল যাকে প্রধানমন্ত্রী ঈশান কোণ বলেছেন, তা অচিরেই সোনালি কোণে পর্যবসিত হবে।

যে কোনও উন্নয়ন নীতির ক্ষেত্রে কোন মডেল অনুসরণ করা হবে, তা নিয়ে বিদগ্ধজন, পরিকল্পনাপ্রণেতা, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থ-শাস্ত্রীদের মধ্যে অনেক আলোচনা, বিশ্লেষণ ধারাবাহিকভাবে হয়ে এসেছে। দেখা গেছে দেশের অন্য অংশে অনুসৃত মডেল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রযোজ্য নয়। এর মূল কারণ শুধু ভৌগোলিক নয়, নানা বৈচিত্রপূর্ণ মানবগোষ্ঠী ও তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাও বটে। তাই তত্ত্বগত ও রূপায়ণগত নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

পূর্বোত্তর ভারতে এই যে জটিল পরিস্থিতি—জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের নানা রং ও বর্ণের সমাহার, দুশোর উপর উপজাতি, ততোধিক ভাষা ও উপভাষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার নানা পর্যায়, সেটাই সমস্যার মাত্রাকে বহুমুখী করেছে। ভৌগোলিক অসম অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা সমস্যার জটই শুধু বাড়ায়নি, মসৃণ ও সুষম উন্নয়নের প্রতিবন্ধকও বটে। আইন-শৃঙ্খলা, সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে দুর্নিবার বিঘ্নস্বরূপ। রাজ্যগুলির দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানা থাকায় অবৈধ অভিবাসন, নিষিদ্ধ দ্রব্যের চোরাচালান অনেক সময় শান্তি বিঘ্নিত করে ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি করে। এছাড়া বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংকীর্ণ পরিচিতিভিত্তিক রাজনীতি ও নানা দল-উপদলের কর্মধারা, বিক্ষোভ, আন্দোলন যা অনেক সময় হিংসাত্মক হয়ে ওঠে, বিদ্রোহীদের অবৈধ কার্যকলাপ এসবকে সামলে নিয়েই এগোতে হবে।

এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির দিকে নজর করলেই বোঝা যায়, নানা সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠীর সমষ্টি, সংমিশ্রণ, অতুল প্রাকৃতিক বৈভব একটি অনন্য সৌন্দর্য ও গৌরব এনেছে। অরুণাচল প্রদেশের ১৬টি পাহাড়ি জেলায় ২৬টি প্রধান জনজাতির বাস। এর অতিরিক্ত ছোট ছোট আরও উপজাতি রয়েছে। এখানে জনবসতির ঘনত্ব খুব কম। প্রতি বর্গকিলো-মিটারে মাত্র ১৩ জন।

মায়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন আন্‌জ জেলায় প্রথম সূর্যোদয়ের আভা, পাহাড়ের সবুজ সৌন্দর্য, বরফে ঢাকা শৃঙ্গ, কত অজানা বন ও প্রাণীসম্পদ যে কোনও পর্যটককে মুগ্ধ করবে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং, লোহিত, তিরাপ-সহ অজস্র নদী এই ভূখণ্ডটিকে অতুলনীয় বৈভবে ভূষিত করেছে। নাগাল্যান্ডে ১৬টি সংস্কৃতিতে পৃথক উপজাতির বাস। এই প্রদেশের ১৩টি জেলায় আও, আঙ্গামি, সেমা, কনিয়াক প্রভৃতি প্রধান উপজাতি রয়েছে। মেঘালয়ে তিনটি প্রধান উপজাতির খাসি, প্নার ও গারো উপজাতি যথাক্রমে খাসি হিল্‌স, জয়ন্তিয়া পাহাড় ও গারো পাহাড়ের বাসিন্দা। খাসি ও প্নার উপজাতিরা অস্ট্র-এশিয়াটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আর গারোরা বোড়ো জাতি থেকে উদ্ভূত। মণিপুর রাজ্যে সমতলে মৈতেই (Meitei) সম্প্রদায় আর পাহাড় অঞ্চলে তাংখুল, মারাম, মাও, রঙমে, ফুকি প্রভৃতি উপজাতিরা বাস করে। মিজোরামে রয়েছে লুশাই ছাড়াও পয় (লাইজো)। লাখের বা মারা, মার, চাকমা প্রভৃতি উপজাতি। ত্রিপুরাতে ১৯টি উপজাতি। তারা প্রধানত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বয়ংশাসিত জেলা কাউন্সিল (Tripura Tribal Area Autonomous District Council)-এ থাকে। এদের মধ্যে রিয়াং প্রভৃতি উপজাতি উল্লেখযোগ্য। এতে স্পষ্ট যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অস্ট্র-এশিয়াটিক, প্যালিও-মেডিটেরানিয়ান, প্যালিও মঙ্গোলয়েড এবং খুব সম্ভবত নেগ্রিটোএথনিক জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। মনখেমের (Monkhmer) এবং Tibeto-Burman ভাষারও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। নানা ধর্ম—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম সবেরই অস্তিত্ব এ অঞ্চলে রয়েছে। পর্যটকদের কাছে এই বৈচিত্রময় অঞ্চল প্রকৃতই স্বর্গস্বরূপ।

নীচে দেওয়া সারণি-তে ৮টি রাজ্যে মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বোঝা যাবে।

মানবসম্পদের এই যে পরিস্থিতির কথা আলোচিত হল, তার মধ্যেই রয়েছে এই অঞ্চলের উন্নয়নের সম্ভাবনা, রূপরেখার ইঙ্গিত ও বাস্তব দিকনির্ণয়। ভারত সরকার, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি এবং সর্বোপরি উত্তর-পূর্ব কাউন্সিল সেই দিশায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ করতে হবে ২০০৮ সালে ১৩ মে-র বৈঠকে গৃহীত North-East Vision ২০২০-এর কথা। আগরতলায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে ১৭টি অনুচ্ছেদে Vision Statement প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদটি যথোপযুক্ত ও নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক।

'It is recognised that the Partition of India and the denial, since the Indo-Pakistan War of 1965, of transit facilities to physically link all but 29 kilometres of the North-East to the rest of India has severely limited the economic prospects of the North-East. It is further recognised that an imaginative leap in foreign policy,

সারণি-৩

রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	তপশিলি জাতি	তপশিলি উপজাতি
অরুণাচল প্রদেশ	১৩,৮৩,৭২৭	০	৯,৫১,৮২১
অসম	৩,১২,০৫,৫৭৬	২২,৩১,৩২১	৩৮,৮৪,৩৭১
মণিপুর	২৫,৭০,৩৯০	৯৭,০৪২	৯,০২,৭৪০
মেঘালয়	২৯,৬৬,৮৮৯	১৭,৩৫৫	২৫,৫৫,৮৬১
মিজোরাম	১০,৯৭,২০৬	১,২১৮	১০,৩৬,১১৫
নাগাল্যান্ড	১৯,৭৮,৫০২	০	১৭,১০,৯৭৩
সিকিম	৬,১০,৫৭৭	২৮,২৭৫	২,০৬,৩৬০
ত্রিপুরা	৩৬,৭৩,৯১৭	৬,৫৪,৯১৮	১১,৬৬,৮১৩

সূত্র : জনগণনা রিপোর্ট, ২০১১

defence policy and internal security policy, as much as in investment, infrastructural and commercial policy is required to end the Region's geo-political isolation and put it on the path to accelerated and inclusive growth.' অর্থাৎ, সংক্ষেপে, এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি ব্যাপক ও সম্মিলিত নীতি যার মধ্যে বিদেশ নীতি, প্রতিরক্ষা নীতি ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা নীতি অনুস্যূত থাকবে, সেটি প্রয়োজন। বিনিয়োগ, পরিকাঠামো নির্মাণ ও যথাযথ বাণিজ্যিক নীতি গ্রহণ করলেই এই অঞ্চলকে দ্রুত ও সার্বিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

এই যে সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বৈচিত্রে ভরা জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে, সমস্ত শ্রেণি ও বর্গের অন্তর্ভুক্তিকরণের মধ্য দিয়ে যে উন্নয়ন, তার আদর্শ বা মডেল দেশের অন্য অঞ্চল থেকে যে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হতে বাধ্য, তা বলাই বাহুল্য। মূল কথাটি হল—'inclusive growth calls for inclusive governance' এই Inclusive Governance-এর বর্তমান চিত্রটির দিকে তাকানো যাক। উত্তর-পূর্ব ভারতে আবহমানকাল থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যে সমস্ত আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল, তা সামূহিক এবং সমগ্র সমাজকে কেন্দ্র করে। এর ফলে যখন পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থা চালু করা হল, তখন সমগ্র সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশ অসম ও ত্রিপুরার বৃহত্তর অংশে এবং মণিপুরে ইম্ফল উপত্যকায় এটি সহজেই গ্রহণযোগ্য হল এবং রূপায়িত হল। মেঘালয় ও মিজোরামের সমস্ত অংশে আর অসম ও ত্রিপুরার কোনও কোনও অঞ্চলে ষষ্ঠ তপশিলের অধীনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হল। মণিপুরের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে গ্রামীণ স্তরে সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে রাজ্য সরকারের আইন ও নিয়ম অনুসারে। নাগাল্যান্ডে গ্রাম কাউন্সিল ও গ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আছে। নাগাদের নিজস্ব সামাজিক নিয়ম অনুসারে, যা রাজ্যের আইন দ্বারা অনুমোদিত। তৃণমূলস্তরে উন্নয়নের জন্য যে ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন, যেমন গ্রামসভা, গাঁও বুড়ার নেতৃত্বে কমিটি তা এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রয়েছে। যা গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বমূলক ও সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয়। গ্রামীণ সমাজে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ ও সকলের জন্য সুফল বয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে এবং হবে। আর আগে থেকে চলে আসা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বর্তমানের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি মিলে যাওয়ায় একটি সাযুজ্যপূর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভবে উন্নয়নের পথটিও মসৃণ হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)-র ৮০ ভাগেরও বেশি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র থেকে আসায় যে কোনও উন্নয়ন মডেলে কৃষির গুরুত্ব সবচেয়ে উঁচুতে থাকতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ঐতিহ্য-পরম্পরা অনুযায়ী যে শস্য উৎপাদনের ধারা রয়েছে তার পরিবর্তন প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত কম সময়সীমায় উৎপাদন হওয়া ধান্যশস্য খরিফ মরশুমে আর গম, ভুট্টা, সরিষা ও শাকসবজি রবি মরশুমে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। উদ্যান বিভাগের উৎসাহে ফুলচাষ, উন্নততর প্রযুক্তি, বিশেষ করে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার এ অঞ্চলের সমৃদ্ধি আনয়নে সহায়ক হবে। ওষধি ও সুগন্ধি গাছ-গাছালির ক্ষেত্র অধিকতর মনোযোগ সিকিমের মতো রাজ্যে যে বিপ্লব আনবে তা বলাই যায়। বাঁশগাছ, রবার, মশলা, বিভিন্ন ফল ও চা-বাগানগুলির পুনরুজ্জীবন এই আর্থিক রণকৌশলের অপরিহার্য অঙ্গ। এর সঙ্গে রয়েছে বনসৃজন ও বৃদ্ধি যার ফলে জীববৈচিত্র, জিনগত সম্পদ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উৎসাহ পাবে। ধীরে ধীরে 'জুম চাষ' যা মাটির ক্ষয় বাড়ায়, তা ক্রমে ক্রমে কমিয়ে টেরেস চাষ (terrace cultivation) শুরু করা এবং দরিদ্র উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য বিকল্প রুজিরোজগারের ব্যবস্থা এই উন্নয়ন মডেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

পশুপালন, মৎস্যচাষ, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, পক্ষীপালন ও এ সবের সঙ্গে পশুখাদ্য দ্রব্যের উৎপাদনে উৎসাহ বৃদ্ধি এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাজারজাত করার বিশেষ ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে দেশের বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে যথাযথ সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করা যাতে চাষিরা সুফল ভোগ করতে পারে। এর জন্য উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যের প্রচার ও প্রসার এবং তৃণমূলস্তরে প্রকৃত চাষিরা যাতে উপকৃত হয় তার জন্য পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে অভিনব উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। যাতে শস্য ও খাদ্যদ্রব্যের অপচয় না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় হিমঘর নির্মাণ (Cold Chain) ও যথার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও বাজারজাত করার জন্য গ্রামীণ সড়কপথ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও চাষিদের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণের সংস্থান করা, উৎপন্ন পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা, শস্যবিমার প্রকল্প, কৃষি সমবায় ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা—এ সবই করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার লক্ষ্যে ছোট শিল্প ও স্বনিযুক্তির প্রকল্প প্রণয়ন এই নীতির অঙ্গ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচব্যবস্থার বিস্তারের জন্য নতুন প্রকল্প ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তার বাস্তবায়ন এ অঞ্চলের অর্থনীতিকে সবল করবে বলেই আর্থিক নীতিনিয়ামক ও সমাজবিজ্ঞানীরা একমত। যাতে আর একটি সবুজ বিপ্লব এই উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে শুরু হয় তার জন্য সরকারকে সজাগ থাকতে হবে এবং এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে সর্বশ্রেণির জন্য দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের পথ সুগম হবে। এই ধরনের 'Inclusive Growth'-এর জন্য সুষ্ঠু পরিকাঠামো বিকাশের উপর জোর দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর মধ্যে রয়েছে—(১) সড়ক সংযোগ, (২) রেলপথের বিস্তার ও ব্রডগেজে রূপান্তর, (৩) বিমান যোগাযোগ, (৪) টেলিকম ও সাইবার সম্পর্ক, (৫) অভ্যন্তরীণ জলপথের সম্প্রসারণ এবং (৬) বিদ্যুৎ উৎপাদনের নানা প্রকল্প ও তার বাস্তবায়ন। এই সব পরিকাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে যাতে শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী মানুষেরা উপকৃত হয় প্রশাসনকে সেটি সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৯৯৭-এ North-East Industrial Policy (NEIP, 1997) গ্রহণ করার পর

পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে বিনিয়োগ আসা শুরু হয়। এর পর North-East Industrial Investment and Promotion Policy (NEIIPP) ২০০৭ যখন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির জন্য প্রণয়ন করা হল, তখন দ্রুত ও ব্যাপক শিল্পায়নের কথা ভাবা হয়েছিল। শুধু বড় শিল্প নয়, ছোট ও মাঝারি শিল্পও এর আওতায়। এছাড়া, পরিষেবা ক্ষেত্র, পর্যটন, অতিথি-সেবামূলক শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা এর অন্তর্গত। The North-East Development Finance Corporation (NEDFC) এবং ভারতীয় চেম্বার অব কমার্স-এর উপর NEIIPP, 2007-এর রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কয়লা, চুনাপাথর, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উত্তোলনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মূল কথাটি হল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-এ বিভিন্ন ক্ষেত্রের অংশ যাতে বাড়ে ও বহুমুখী হয় তার দিকে নজর দেওয়া। এর জন্য সরকারি, বেসরকারি ও যৌথ ক্ষেত্রে বর্ধিত বিনিয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

মানবসম্পদ এ অঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের বড় হাতিয়ার। সাক্ষরতার হার বেশ উঁচু স্তরে—বেশিরভাগ রাজ্যেই জাতীয় গড়পড়তা হারের উপরে। পূর্বে দেওয়া একটি সারণি-তে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

তবে যেটার অভাব রয়েছে, সেটি হল উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সুযোগ। সেজন্য শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি কর্মকুশলতা বৃদ্ধির উপর Vision ২০২০-এর দলিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক অসম সফরে (১৯ জানুয়ারি, ২০১৬) অসমের তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের যুবসমাজ—আইআইটি, এনআইটি এবং ওই অঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এ বিষয়ে তিনি সরকারের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

'পুবে কাজ কর' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্প প্রণয়ন আর একটি অগ্রাধিকারের বিষয়। রাজ্যগুলির শতকরা ৯৬ ভাগ সীমানা আন্তর্জাতিক সীমানা। ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলটির জন্য Vision ২০২০ দলিলে বলা হয়েছে—

'It is necessary to factor in new inputs in foreign, defence, internal security and international trade policy. To this end the immediate priority is to build the required infrastructure right up to the Border areas, establishing connectivity and communication links to the cross-border points through which trade and economic exchanges with the countries neighbouring the North-Eastern Region are proposed to be promoted...' অর্থাৎ সংযোগব্যবস্থা ও পরিকাঠামো এমনভাবে নির্মাণ করা দরকার যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান সম্ভব হয়। এর জন্য নানা কূটনৈতিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এটি অবশ্যই একটি নতুন উন্নয়নের মডেল। 'New paradigm where foreign policy initiatives blend seamlessly with our national economic development requirements.' অর্থাৎ এই মডেলে বিদেশ নীতির উপর নানা উদ্যোগ নেওয়া হবে এমনভাবে যা জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়।

এই নতুন মডেলের রূপায়ণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রক (Ministry of Development of North-Eastern Region) সংশ্লিষ্ট আট রাজ্যের রাজ্য সরকার, উত্তর-পূর্বাঞ্চল কাউন্সিল ও বিভিন্ন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় বহুমুখী রণকৌশল প্রস্তুত করে পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান ও শিক্ষণপ্রাপ্ত পারদর্শী কর্মীদের নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। যে বিষয়ের উপর নজর রাখতে হবে তা হচ্ছে বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলি যেন স্বচ্ছ, শক্তিশালী, দুর্নীতিমুক্ত ও সক্রিয় হয়। যেমন, NEC-এর অধীন প্রতিষ্ঠানগুলি যার মধ্যে রয়েছে NERIWALM, NEDFI NERA MAC প্রভৃতি। এতে দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তি ও উত্তম প্রশাসনের শর্তাবলি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে হানিকর কার্যাবলি ও কয়েকটি জনগোষ্ঠীর একাংশের বিদ্রোহাত্মক ও হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধ হবে। জাতীয় মুখ্যধারায় ফিরে এলে সুষম উন্নয়ন সহজতর হবে। সমগ্র দেশে যে প্রগতির হার তার তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রগতির হারের যে পার্থক্য তা দ্রুত কমিয়ে আনতে অধিক বিনিয়োগের দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার জরুরি। তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যে রূপায়িত করা যায় বা short gestation projects-এ প্রসঙ্গে কার্যকরী। আটটি রাজ্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পখাতে ব্যয় মেটানোর বিষয়ে নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্য সরকারগুলির অংশগ্রহণ কম করা হয়েছে—শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ। অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে ওটি শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ। এছাড়া প্রকল্পবাবদ সাধারণ কেন্দ্রীয় সাহায্যে (Normal Central Assistance) শতকরা ২০ ভাগ পরিকল্পনা বহির্ভূতখাতে ব্যয়ের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। যে প্রকল্পগুলিতে বিদেশি সাহায্য রয়েছে তার পরিশোধের বিষয়েও শর্তাবলি শিথিল করা হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি Non-lapsable Central Pool of Resources (NLCPR) বা অ-তামাদি কেন্দ্রীয় সহায়সম্পদ, অর্থাৎ আর্থিক বছরের শেষে তামাদি না হওয়া একটি বিশেষ তহবিল ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। এর ফলে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই তহবিল থেকে অর্থ পেতে অসুবিধা হবে না। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, বিভিন্ন কেন্দ্রীয়মন্ত্রকের Plan Budget বা পরিকল্পনাখাতে বাজেট অর্থের অন্তত শতকরা দশ ভাগ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ প্রকল্পের জন্য সাহায্য বা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যেমন, (১) ২০০৮-০৯ সালের বাজেট ঘোষণায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল গঠন। (২)

বিশেষ সড়ক নির্মাণ ত্বরান্বিতকরণের প্রকল্প বা Special Accelerated Road Development Programme for North-East (SARDPNE)। (৩) অ-তামাদি উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প (Non lapsable North-East Railway Development Fund)-এর শতকরা ২৫ ভাগ থাকবে রেলমন্ত্রক থেকে আর ৭৫ ভাগ অর্থমন্ত্রক থেকে। (৪) North-Eastern Region Bio-Technology উন্নয়ন কর্মসূচি। (৫) উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলির জন্য বৃক্ষরোপণ বা হর্টিকালচার মিশন। (৬) বয়নশিল্প উন্নয়ন কারিগরি মিশন। (৭) অসম, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে মাজুলি দ্বীপ, কারবি আংলঙ তিরাম প্রভৃতি স্থানে বিশেষ প্রকল্প। (৮) দক্ষতা বৃদ্ধি। (৯) নারী ও শিশুকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি প্রভৃতি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকে বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হয়। ৩.৮০ গুণেরও বেশি। সে সময় থেকে এদের বিশেষ শ্রেণিভুক্ত রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গতবছর এটি অবশ্য স্থগিত করা হয়েছে। জনপ্রতি গড় কেন্দ্রীয় সাহায্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে ২৫৭৪.৯৮ টাকা ছিল। আর জনপ্রতি সমগ্র ভারতের গড় কেন্দ্রীয় সাহায্য ছিল মাত্র ৬৮৩.৯৪ টাকা। এই প্রবণতা একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনাতে লক্ষ করা যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীরা বিশেষ ব্যবস্থা জারি রাখার পক্ষে আবেদন করেছেন।

সর্বভারতীয় উন্নয়ন মডেলে স্থানীয় ভিন্নতা, জীবনধারা, মূল্যবোধ ও প্রয়োজন অনেক সময় অবহেলিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এতে স্থানীয় স্তর থেকে বিরোধিতা ও প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়। তথাকথিত উন্নয়নের Juggernaut-এর চাপের নীচে সেই মানুষগুলোর নাভিশ্বাস উঠতে পারে। তাই প্রগতির ধারার সমাজতাত্ত্বিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি দিতেই হয়। এর সঙ্গে পূর্বে আভাস দেওয়া দুটি বিষয়ের কথা আবার বলতে হয়। প্রথমটি কয়েকটি বিক্ষুব্ধগোষ্ঠীর হিংসাত্মক প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের পথে যাওয়া। এদের মধ্যে যারা সংবিধানের দায়রায় থেকে জাতীয় মূলস্রোতের অংশ হতে চায় তাদের ফিরিয়ে আনা এবং বিভিন্ন স্তরে আলোচনার পথে সমস্যার নিষ্পত্তি করা জরুরি। আন্তর্জাতিক সীমানাকে সুরক্ষিত করে অবৈধ অভিবাসন, আতঙ্কবাদী বিদ্রোহীদের আনাগোনা ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয়টি 'পুবে কাজ কর' নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রান্ত দ্বার। তাই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। ASEAN-ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধি করবে সন্দেহ নেই।

২০১৫-এর জুন মাসে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে আলোচনার পর যে ২২ দফা সম্মতিপত্র স্বাক্ষরিত হল তাতে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল, তাতে সন্দেহ নেই। এতে ত্রিপুরার পলাটনায় বিদ্যুৎ কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি ও খাদ্যদ্রব্য বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় নিয়ে যাবার অনুমতির কথা আছে। কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা, ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটির মধ্যে বাস পরিষেবা, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি, ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ স্থাপন, ভারত বাংলাদেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলপথ ব্যবহারের অনুমতি, বাংলাদেশে ভারতের বিনিয়োগ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির পক্ষে লাভবান হবে।

আগের আলোচনা থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সার্বিক উন্নয়নের যে কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত নকশা পরিস্ফুট হল, তার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ মূল পদক্ষেপগুলি এই রকম।

প্রথমত, পরিকাঠামো নির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বা কানেক্টিভিটি স্থাপন। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অসমে মোটামুটিভাবে ওটি আছে. তবে এর সম্প্রসারণ ও ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ হয়ে চলেছে। বঙ্গাইগাঁও-নর্থ লখিমপুর বা ডিব্রুগড় ও লামডিং-শিলচর সেকশনের উল্লেখ করা যায়। বর্তমান বছরের (২০১৬-১৭) রেল বাজেটে রেলমন্ত্রী উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। North-East Frontier Railway-এর জন্য বাজেটে বরাদ্দ ৩৫,০৬৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। লামডিং-শিলচর ব্রডগেজ লাইনে রেল চলাচল শুরু হয়েছে। শিগগির মিজোরাম ও মণিপুর ব্রডগেজ নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে।

কাটাখাল-ভৈরবী এবং অরুণাচল-জিরিবাম গেজ পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপনের কাজ এগোচ্ছে। অরুণাচলের সঙ্গে দিল্লির রেল যোগাযোগ হয়েছে।

সড়ক পরিবহণের উন্নতিতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে অসমে আগামী পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ২৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। এছাড়া সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে সড়ক ব্যবস্থায় উন্নতিতে এক লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিব্রুগড় জেলার মোরানে চার লেন বিশিষ্ট ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হবে। নগাঁও বাইপাসের শেষ প্রান্ত থেকে রাঙাগড় অবধি, রাঙাগড় থেকে কালিয়াবোর-তিনালি পর্যন্ত, দেমো থেকে মোরান বাইপাসের শেষপর্যন্ত, মোরান বাইপাসের শেষপ্রান্ত থেকে লেপকাথার বোগিবেল পর্যন্ত নতুন সড়ক নির্মাণ হবে। এছাড়া ভুটান সীমানা বরাবর শ্রীরামপুর ও ধুবড়ির মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা তিনসুকিয়া থেকে অরুণাচলপ্রদেশ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করা হবে। করিমগঞ্জ বাইপাস, শিলচর, জিরিবাম, বদরপুর প্রভৃতি এলাকায় সড়ক যোগাযোগ উন্নতি করা হবে। ব্রহ্মপুত্রের উপর চারটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে। মাজুলি থেকে জোরহাট পর্যন্ত সংযোগকারী সেতু নির্মাণ করা হবে। পাণ্ডুতে একটি জাহাজ মেরামতি কারখানার শিলান্যাস করা হয়েছে। ধুবড়ি ও হাতসিঙ্গিমারির মধ্যে ফেরি চলাচল পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে আর একটি অমিত সম্ভাবনা ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন,

বিশেষত জলবিদ্যুৎ। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (Central Electric Authority) দ্বারা পরিচালিত একটি সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে সমগ্র দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন (hydrocarbon) সম্ভাবনা ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০১ মেগাওয়াট। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের উৎপাদন সম্ভাবনার পরিমাণ ৬২ হাজার ৬০৪ মেগাওয়াট। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১,২৪২ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন দশটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এছাড়া ১৬টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নির্মীয়মাণ। এগুলি রূপায়িত হলে ৫,৫৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে রয়েছে অরুণাচলপ্রদেশে তিনটি প্রকল্প। যথাক্রমে, National Hydropower Corporation-এর অধীনে সুবনসিরি লোয়ার প্রকল্প, North-Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO)-এর অধীনে কামেং ও পারে প্রকল্প দুটি। বেসরকারি ক্ষেত্রে Gongri-তে আরও একটি প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। মিজোরামে NEEPCO তুইরিয়াল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করছে। আর মেঘালয় রাজ্য সরকার New Umtru জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সিকিমে ১০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বেসরকারি স্তরে নির্মাণ করা হচ্ছে। জোরেথাংলুপ, ভাসমে, তিস্তা-III এবং VI, তাশিডিং প্রভৃতি স্থানে। বর্তমানে ৬৬৯ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রয়েছে। একহাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এই অঞ্চলে চলছে। ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক ৭২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প পলাটোনায় চালু করা হয়েছে।

উন্নয়নের এই রূপরেখায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে পর্যটন শিল্প। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র, অগণিত মানবগোষ্ঠী ও তাদের নানা ধরনের জীবনশৈলী উত্তর-পূর্ব ভারতকে এক অনন্য মর্যাদা দিয়েছে। যেমন, অরুণাচলে কয়েক শতাব্দীর পুরোনো বৌদ্ধমঠ, বিরল বন্যপ্রাণী, কত সংস্কৃতি ও জনজাতি ও উপজাতির সংমিশ্রণ এই সূর্যোদয়ের দেশকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় উন্নীত করেছে। তাওয়াং মঠ, পরশুরামকুণ্ড, কামেং, সুবনসিরি, সিয়াং উপত্যকা, লোহিত, তিরাপ উপত্যকা অনেক পর্যটক টানতে পারে। অসমে অপার ব্রহ্মপুত্র, মাজুলি দ্বীপ, কামাখ্যা তীর্থক্ষেত্র, কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক, চা-বাগান ও শ্যামলিমায় ভরা এই প্রদেশ প্রকৃতই অতুলনীয়। ত্রিপুরা, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও সিকিমে পর্যটন শিল্পেরও সম্ভাবনা বিশাল। এই অঞ্চলকে, ভারতের ঈশান কোণকে পর্যটনের ক্ষেত্র 'সোনালি ক্ষেত্র' বলে স্বচ্ছন্দে অভিহিত করা যায়।

রাজ্যগুলিতে সাক্ষরতার হার বেশি থাকায় পরিষেবা ক্ষেত্রেও এই অঞ্চলের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে অসম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা বেশ ভালো। কারিগরি পার্ক নির্মাণ, তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ দিলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অচিরেই সম্ভব। তাই পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ উন্নয়ন মডেলে অগ্রাধিকার পাবে।

কৃষি, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজন উন্নয়নের দিগন্ত প্রসারিত করবে। 'জুম' চাষের পরিবর্তে 'টেরেস' চাষ ও মৃত্তিকা সংরক্ষণে জোর দেওয়া প্রয়োজন। আবহাওয়া, ভৌগোলিক পরিস্থিতি, মাটির গুণাগুণ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি বিচার করে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, বীজ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করে উপযুক্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণ জরুরি।

কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকি, সংরক্ষণ নীতি ও মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি প্রয়োজন। খরিফ শস্য ছাড়াও নানা ধরনের রবিশস্য, 'ক্যাশ ক্রপ্‌স' (cash crops) উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে রয়েছে সুপারি, কাঁচা রবার, আদা, লঙ্কা প্রভৃতি। এই সমস্ত শস্য বাজারজাত করা এবং তাদের লাভজনক মূল্যমান ধরে রাখা সরকারগুলির অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। নচেৎ এ অঞ্চলের কৃষকেরা এক নিশ্চিত আয়ের উৎস থেকে বঞ্চিত হবে।

অতএব একটি দীর্ঘমেয়াদি, কার্যকর ও স্থায়ী সমাধানের সূত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের আমূল পরিবর্তন, যা পরিবেশ ও প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই ও জনগণের গ্রহণযোগ্য হবে, তার জন্য চাই একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও কল্যাণকারী সুশাসন।

'It is no longer the availability of financial resources but the capacity of institutions and individuals in the North-East to make effective use of available resources that is proving the central constraint to growth' (North-Eastern Region Vision 2020).

অর্থাৎ অর্থসম্পদের জোগান ততখানি নয় যতখানি প্রয়োজন যে সম্পদ আছে তার সদ্ব্যবহার করার মতো প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি। এটাই এ অঞ্চলের উন্নয়নের বড় সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ।

এটা দেখা গেছে জনসংখ্যা ও আয়তনের বিচারে দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর-পূর্ব ভারতে কেন্দ্রীয় সাহায্য ও অর্থ যার মধ্যে অ-তামাদি কেন্দ্রীয় সহায়সম্পদ রয়েছে, তার অনুপাত অনেক বেশি। যে জন্য উত্তর-পূর্ব ভারত উন্নয়নমন্ত্রক, উত্তর-পূর্ব কাউন্সিল ও আট রাজ্যের রাজ্যগুলির পক্ষে একযোগে দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ যেন অনেকটা সপ্তসিন্ধুর অন্যতম সেই ব্রহ্মপুত্রের মতো, যার উৎস সুউচ্চ তিব্বতে—Yarlung Tsangpo নামে। পলি-লালিত অববাহিকার জন্য যেমন প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত বন্যা নিয়ন্ত্রণ যোজনা, তেমনই জরুরি এর নিরন্তর প্রবাহ বজায় রাখা।❑

[লেখক সামাজিক নৃতত্ত্ব বিষয়ে Ph.D. উত্তর-পূর্ব ভারতের আদিবাসী উপজাতি ও সামাজিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও পরিবর্তন সংক্রান্ত পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো সম্পর্কে তিনি একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর এই অবদানের পাশাপাশি, পেশাগতভাবে তিনি প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেল, সমাচার, আকাশবাণী এবং প্রাক্তন প্রেস রেজিস্ট্রার, ভারত সরকার।
email : bandyopk@yahoo.co.in
website : www.pradiptobandopadhyay.com]

উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে বর্তমান ত্রিপুরা

সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

*ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই ত্রিপুরা রাজ্যটি রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আবার সেই একই কারণে এ রাজ্য নানান সমস্যার সম্মুখীন। ত্রিপুরায় কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ ও নগরোন্নয়ন—এ সব ক্ষেত্রগুলির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন—***সপ্তর্ষি মিত্র** *ও* **স্তবক রায়।**

উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা বিশ্ব রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য ত্রিপুরা—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ্যটি তিনদিক—উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং উত্তর-পূর্বে আসাম ও পূর্বে মিজোরাম রাজ্য অবস্থিত। রাজ্যটির মোট সীমান্ত ১,০১৮ কিলোমিটার যার ৮৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৮৫৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত যা ত্রিপুরাকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অবশিষ্ট সীমান্তের ৫৩ কিলোমিটার আসাম ও ১০৯ কিলোমিটার মিজোরামের সঙ্গে সংযুক্ত। একমাত্র ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক আসামের করিমগঞ্জ জেলার মধ্যে দিয়ে মেঘালয়ের শিলং শহরের ওপর দিয়ে আসামের প্রাণকেন্দ্র গুয়াহাটি হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরাকে যুক্ত করে।

১০,৪৯১ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ২২°৫৬´ থেকে ২৪°৩২´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০°০৯´ থেকে ৯২°২০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। স্থলবেষ্টিত রাজ্যটি পাহাড়, উপত্যকা ও সমভূমি দ্বারা বিস্তৃত। পাহাড়গুলির মধ্যে অন্যতম বড়মুড়া, আঠারোমুড়া, লংতরাই ও সাকাংথাং। হাওড়া, গোমুতি, খোয়াই, ধলাই, মনু, জুরি, মহুরি ও ফেনীর নদী উপত্যকায় গড়ে ওঠা শহরগুলি হল আগরতলা, উদয়পুর, খোয়াই, আমবাসা, মনু, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও সাব্রুম। প্রাকৃতিক বৈপরীত্য রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্তরায় হলেও উন্নয়ন কখনও স্তম্ভিত হয়ে যায়নি। উন্নয়নের নিরিখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অগ্রগামী রাজ্যগুলির মধ্যে বর্তমানে প্রথম সারিতে অবস্থান করে ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। দরিদ্রতা, স্বল্প মাথাপিছু আয়, সীমিত উৎপাদন, স্বল্পোন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো, ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, শ্লথ শিল্পায়ন ও উচ্চ বেকারত্বের হার এই অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আদিবাসী আন্দোলন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিগত দুই দশক ত্রিপুরার অর্থনীতি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ২০05 সালের পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে। বিশেষ কোনও খনিজ সম্পদ না থাকলেও প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল সম্ভার আছে এই রাজ্যে।

১. কৃষি

ত্রিপুরার অর্থনীতি গ্রাম ও কৃষিভিত্তিক। শেষ দুই দশকে ত্রিপুরা রাজ্য কৃষিতে উন্নতি করেছে। ভূমি সংস্কারের প্রভাবে এই রাজ্যের গড় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। রাজ্যের মোট ভূমিভাগের মাত্র ২৭ শতাংশ কৃষিযোগ্য যা জাতীয় সূচকের তুলনায় অনেক নীচে অবস্থান করে। রাজ্যের কৃষিকাজ প্রধানত মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। বিগত কয়েক বছরে জনসংখ্যার প্রবল চাপ রাজ্যের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। ২০১১ সালের ভারতীয় আদমশুমারির তথ্যানুসারে প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল, ২০০১ সালে যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৫১ শতাংশ। ২০১০-১১ সালের কৃষি সমীক্ষা থেকে জানা যায় কৃষকের মাথা পিছু ১.২৫ হেক্টর জমি আছে। সামাজিক কারণেই বর্তমানে জমি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে চলেছে।

রাজ্যের মৃত্তিকা যথেষ্ট উন্নত যা বিভিন্ন ধরনের ফসলের পাশাপাশি চা, রাবার ও পাটের মতো অর্থকরী ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। ধান, গম, ভুট্টা, আলু, ভোজ্য তেল উৎপাদনে বর্তমানে যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

রাজ্যের মোট কর্ষিত জমির ৬০ শতাংশ অংশে প্রধানত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। পাহাড়ি অঞ্চলে ঝুম চাষের পদ্ধতি রূপান্তরের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ঘটেছে। রাবার উৎপাদনে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজ্য। বিগত কয়েক বছরে ত্রিপুরায় রাবার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মোট উৎপাদিত ফসলের প্রায় ১০ শতাংশ। বাজারে কৃত্রিম রাবারের আমদানির ফলে ত্রিপুরায় উৎপাদিত প্রাকৃতিক রাবারের মূল্য আকস্মিকভাবে নিম্নগামী হয়ে পড়েছে। তবুও একটি বড় অংশের মানুষ রাবারের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃত অর্থে ত্রিপুরার কৃষি অর্থনীতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে রাবার। বর্তমানে

উৎপাদন ও গুণগত মানের নিরিখে ত্রিপুরার রাবার ভারতবর্ষে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। চা উৎপাদনে বিশেষ কৃতিত্ব না থাকলেও একটি বড় অংশের মানুষ চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দুর্গাবাড়ি, মনুভ্যালি, বিশালগড়ের চা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়। অনেক স্থানেই ত্রিপুরার মৃত্তিকা কৃষির পক্ষে সহায়ক নয়। ত্রিপুরার কৃষি মৌসুমি বৃষ্টিপাতের উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়ার কারণে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। ত্রিপুরার নদীগুলি বর্ষার জলে পুষ্ট হওয়ায় গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত জলে ঘাটতি ঘটে যা সেচ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। উন্নত বীজ ও সারের জন্য ত্রিপুরাকে অন্য রাজ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তি আধুনিক না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্রম নির্ভর ও স্বল্প উৎপাদনশীল। জনসংখ্যার চাপ ও চাহিদা নিবারণের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপ যেমন কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, উন্নত বীজ ও সারের ব্যবহার, কৃষি ঋণ প্রদান, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা, কৃষিজাত পণ্যের বাজার মূল্য নির্ধারণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যা ত্রিপুরার কৃষি অর্থনীতিকে অদূর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধিশালী করে তুলবে।

সারণি-১

জমির পরিমাণ (হেক্টর)	কৃষক পরিবার	জমির মোট আয়তন (হেক্টর)
< ০.৫	৪,০৫,১৫০	৭১,৭৫৪
০.৫-১.০	৯৩,৯০৪	৬৭,৯৪৬
১.০-২.০	৫৫,০৪৩	৭৫,৮০৯
২.০-৩.০	১৮,১৮৮	৪২,৮৪৭
৩.০-৪.০	৩,৩৫৬	১১,৪১৮
৪.০-৫.০	১,৭৬০	৭,৭৭৬
৫.০-৭.৫	৮৪৫	৪,৯০০
৭.৫-১০	১৪৭	১,২৬৭
১০ >	৫,৭৮,৫৬৫	২,৮৬,১৭৩

উৎস : ত্রিপুরা ভূমি ও রাজস্ব দপ্তর, ২০১০-১১

সারণি-২

উৎপাদিত ফসল	কৃষিবর্ষ		
	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ধান	৫৪.৫	৫৫.৮	৫৬.৩
গম	০.১৬	০.২০	০.১০
ভুট্টা	০.৪৩	০.৭০	০.৮০
ভোজ্য তেল	০.৭৬	০.৯০	১.০

উৎস : কৃষি সমীক্ষা, ২০১০-১১

২. শিল্প

শিল্পায়ন যে কোনও রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সোপান। ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কাঁচামাল, দক্ষ শ্রমিক, বাজার, মূলধন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প পরিকাঠামো ও চাহিদা যে কোনও শিল্পের উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

অবস্থানগত ভাবে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে তিনদিক বাংলাদেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ ভারতীয় অঙ্গরাজ্য। এই বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে, শিল্পায়নও এর ঊর্ধ্বে নয়। বলাবাহুল্য, রেলপথ সংস্কারের কারণে ২০১৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। সড়ক পথে আসামের করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি

সারণি-৩

শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	জেলা	স্থাপনকাল	গ্রহণ ক্ষমতা
ইন্দোনগর শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পশ্চিম ত্রিপুরা	১৯৫৮	২৫০
কৈলাশহর শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	উনকুটি	১৯৬২	২৬০
যতনবাড়ী শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গোমুতি	১৯৬২	২০০
উদয়পুর শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গোমুতি	১৯৬২	১৫৫
মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পশ্চিম ত্রিপুরা	১৯৮৮	১৪০
বিলোনিয়া শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দক্ষিণ ত্রিপুরা	২০০৪	১৫৫
আমবাসা শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ধলাই	২০০৪	২১৫
ধর্মনগর শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	উত্তর ত্রিপুরা	২০০৪	১৫৫
মনু বনকুল শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দক্ষিণ ত্রিপুরা	২০১৩	১৬০
বক্সনগর শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিপাইজলা	২০১৩	১৬০
খুমলং শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পশ্চিম ত্রিপুরা	২০১৩	২৪০
খোয়াই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খোয়াই	২০১৩	১৬০
মোট			২৩৭০

উৎস : শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

জেলায় হোক কিংবা কাছাড়ের পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে প্রসারিত। ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কটির মাধ্যমেই শিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ত্রিপুরায় আসে এবং উৎপন্ন পণ্য এই পথেই ভারতীয় বাজারে পৌঁছায়। এই রাস্তার গুণগত মান খুবই খারাপ। কোনও কোনও সময় রাস্তা নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি ত্রিপুরার শিল্প ক্ষেত্রে সব থেকে অন্তরায়। কাঁচামাল শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ত্রিপুরায় কৃষিজ

সারণি-৪			
অর্থবর্ষ	আমদানি	রপ্তানি	মোট
২০০৬-০৭	৪৮.৬৯	০.৮৭	৪৯.৫৬
২০০৭-০৮	৮৪.১৫	১.৫১	৮৫.৬৬
২০০৮-০৯	১২৫.৯৪	০.২৬	১২৬.২০
২০০৯-১০	১৬২.৮৮	০.৪২	১৬৩.৩০
২০১০-১১	২৫৫.৮৮	১.৭২	২৫৭.৬০
২০১১-১২	৩২৯.০৫	১.৫৫	৩৩০.৬০
২০১২-১৩	৩৪২.৬৫	০.৪১	৩৪৩.০৬
২০১৩-১৪	২২৯.৮৩	০.৪১	২৩০.২৪

উৎস : শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

ও খনিজ সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে বড় শিল্প গড়ে ওঠেনি। একমাত্র মাঝারি শিল্পের পর্যায় ভুক্ত পাট শিল্পটিও আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার অন্যতম কারণ কাঁচামালের অভাব। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য ত্রিপুরায় শিল্পে দক্ষ শ্রমিকের অভাব অনুভূত হয় যা শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। শিল্পের উপযোগী বাজারে অভাব ত্রিপুরার শিল্প মানচিত্রকে ক্রমশ দুর্বল করে দিচ্ছে। বেসরকারি বিনিয়োগ শিল্প বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার। এই রাজ্যে বৃহৎ শিল্পে বেসরকারি লগ্নি হার যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। ত্রিপুরা আজও শিল্পে ভারতবর্ষের পিছনের সারিতে অবস্থান করে।

রাজ্য সরকার কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করলে শিল্পের অগ্রগতির উন্নয়নে সদাসচেষ্ট। ত্রিপুরার শিল্প নীতিতে আলোকপাত করলে দেখা যায় রাজ্যে কোন বিনিয়োগকারী ৩০ লক্ষ বা তার বেশি লগ্নি করে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ভরতুকি রাজ্য সরকার বহন করে, বাণিজ্যিক পণ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫ বছর পর্যন্ত বিক্রয়কর মুকুব করে রাজ্য সরকার। এছাড়াও রপ্তানি নির্ভর বাণিজ্য, মহিলা পরিচালিত শিল্প ও শ্রম নির্ভর শিল্পে ৫ শতাংশ অতিরিক্ত ভরতুকি দেয় রাজ্য সরকার।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, রাবার, বাঁশ ও অন্যান্য অনুসারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার পরিকাঠামো প্রদানের উদ্দেশে বিভিন্ন শিল্প উদ্যান গড়ে তুলেছে এবং দক্ষতা উন্নয়নের স্বার্থে ১২টি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

সাম্প্রতিক অতীতে ত্রিপুরায় শিল্পে পূর্বের তুলনায় উন্নতি হয়েছে এবং উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে দক্ষতা উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন সাতটি শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২৩৭০ জন প্রশিক্ষিত দক্ষ শ্রমিক উৎপন্ন করে এই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি।

শিল্পায়নের স্বার্থে রাজ্য সরকার ৯৫.৩৫ একর জমির উপর ৫টি শিল্প তালুক গড়ে তুলেছে, যথা অরুন্ধুতীনগর, বাধারঘাট, ধাজাননগর, ধর্মনগর ও কুমারঘাট। এই শিল্প তালুকগুলিতে আলাদা আলাদা শিল্পের জন্য জমির বিভাজন, উৎপাদন ছাউনি ও অন্যান্য পরিকাঠামো উপলব্ধ। শিল্পের প্রসারের জন্য বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৪০-৫০ একর জমির উপর ৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র-১
ত্রিপুরায় আমদানি-রপ্তানির লেখচিত্র (২০০৬-১৪)

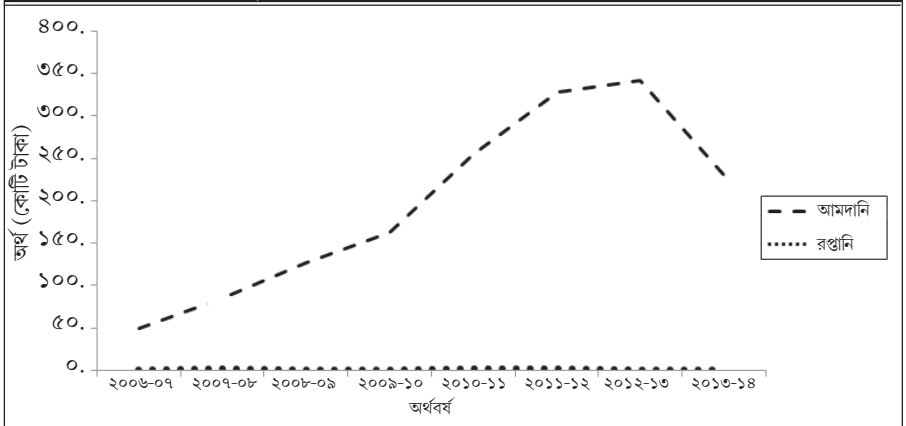

উৎস : শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

চিত্র-২
মোট আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ

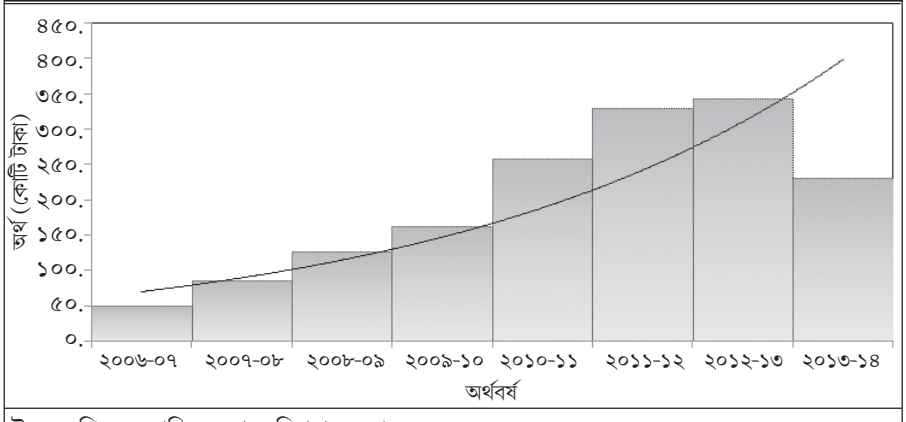

উৎস : শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

সারণি-৫					
জেলা	প্রাথমিক বিদ্যালয়	উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	উচ্চ মাধ্যমিক	মোট
পশ্চিম ত্রিপুরা	৩০৭	১৫৩	৯৮	১০৩	৬৬১
সিপাহিজলা	২৬৩	১৪৭	৯২	৫২	৫৫৪
খোয়াই	২৬৫	১২২	৬১	৩৫	৪৮৩
গোমুতি	২৯৫	১৭৬	৭৪	১১	৫৮৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৩৪৫	১৫৮	১০১	৫৫	৬৫৯
ধলাই	৫৪৩	২৪২	৫৯	২৯	৮৭৩
উনকোটি	১৭৮	৮১	৪৩	৩০	৩৩২
উত্তর ত্রিপুরা	২২৭	১৫২	৬২	৩৯	৪৮০
মোট	২৪২৩	১২৩১	৫৯০	৩৮৪	৪৬২৮

উৎস : স্কুল শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

সারণি-৬		
জেলা	মোট	শতাংশ (বিদ্যালয়)
পশ্চিম ত্রিপুরা	৬৬১	১৪.২৮
সিপাহিজলা	৫৫৪	১১.৯৭
খোয়াই	৪৮৩	১০.৪৪
গোমুতি	৫৮৬	১২.৬৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৬৫৯	১৪.২৪
ধলাই	৮৭৩	১৮.৮৬
উনকোটি	৩৩২	৭.১৭
উত্তর ত্রিপুরা	৪৮০	১০.৩৭
মোট	**৪৬২৮**	**১০০**

উৎস : স্কুল শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

চিত্র-৩
জেলাভিত্তিক স্কুলের পরিসংখ্যান

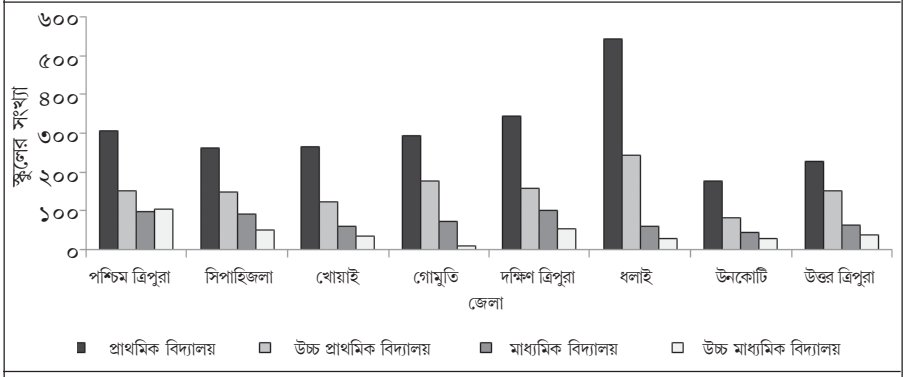

উৎস : শিক্ষা দপ্তর (স্কুল), ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

চিত্র-৪
জেলাভিত্তিক বিদ্যালয়ের শতকরা হার

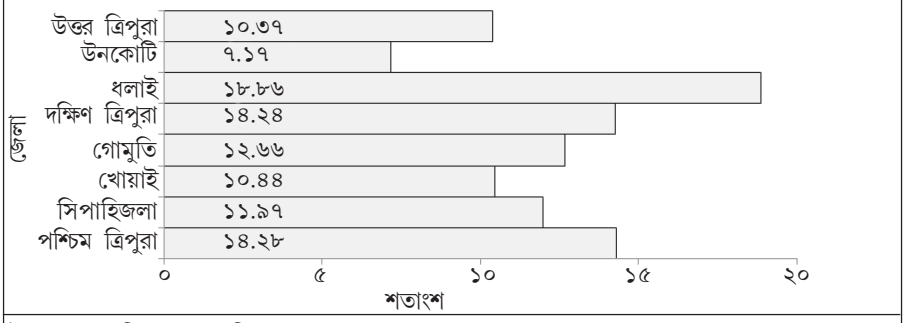

উৎস : স্কুল শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের অবস্থানের কারণে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে বিগত এক দশকে উন্নতি করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের স্বার্থে ১৯৯৫-৯৬ সালে আগরতলা শহরের সন্নিকটে ভারত সরকার ল্যান্ড কাস্টম বা ভূমি দপ্তর গড়ে তোলে। বর্তমানে রাজ্যে মোট ৮টি ল্যান্ড কাস্টম বা ভূমি দপ্তর আছে যথা আগরতলা, সীমান্তপুর, মুহুরিঘাট, ধলাইঘাট, মনুঘাট, পুরানো রাঘানবাজার ও সাব্রুম। এই সীমান্তগুলি দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের এক অন্য দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবর্ষে বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল আর্থিক মূল্যে ৪.১২ কোটি টাকা ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে তা গিয়ে পৌঁছায় ২৩০.২৪ কোটি টাকায়। শেষ কয়েক বছরের আমদানি-রপ্তানির তথ্য নিচে দেওয়া হল—

তথ্যানুযায়ী (লেখচিত্র) থেকে প্রতিভাত হয় প্রতি অর্থবর্ষে ত্রিপুরার আমদানির হার ঊর্ধ্বমুখী যা রাজ্যের উন্নয়ন ও উন্নয়নকামী মানুষের চাহিদাকে নির্দেশ করে। রপ্তানির হারও যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক যা উৎপাদনের উৎসাহকে অন্যমাত্রা এনে দেয়। ২০১৩-১৪ সালে আকস্মিক আমদানির হার পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব অর্থনীতি ও ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পট পরিবর্তনকে দায়ী করা যায়।

ত্রিপুরা বাংলাদেশ থেকে সাধারণত মাছ, সিমেন্ট, ইট, বালি, স্টোন চিপস, পাথর,

পাইপ, টিন, আসবাবপত্র, কাপড়, কাঁচা পাট ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে পক্ষান্তরে ত্রিপুরা রপ্তানি করে মশলা প্রধানত আদা, রং, ধূপ, কাঠ, রাবার, কাগজ ও ফলমূল যেমন কলা, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।

আশা করা যায় ভবিষ্যতে ত্রিপুরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযোগের অন্যতম পথ-মাধ্যম হবে এবং ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক করিডোর (সড়কপথ ও রেলপথ) নির্মিত হলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৩. শিক্ষা

শিক্ষা হল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার যা চাকরির ক্ষেত্র, জ্ঞানের ভাণ্ডার, উন্নত জীবন ও জীবিকার ধারণা, সামাজিক মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতা গঠন করে। ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নয়ন শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৯৭২ সালে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমূল পরিবর্তন ঘটে শিক্ষা ক্ষেত্রে। রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্দেশে বার্ষিক বাজেটের ১২-১৪ শতাংশ অর্থ ব্যয় করে যা ত্রিপুরাকে শিক্ষায় ভারতবর্ষের প্রথম সারির রাজ্য হিসাবে তুলে ধরতে সহায়তা করেছে। ২০১৩-১৪ সালের তথ্যানুসারে রাজ্যে ৪৬২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৪৬২৮টি বিদ্যালয় আছে যার মধ্যে ২৪২৩টি প্রাথমিক, ১২৩১টি উচ্চ প্রাথমিক, ৫৯০টি মাধ্যমিক ও ৩৮৪টি উচ্চ মাধ্যমিক। ধলাই জেলায় সর্বাধিক ৮৭৩টি বিদ্যালয় আছে যার ৬২ শতাংশই প্রাথমিক বিদ্যালয়। ধলাই জেলার আয়তন অন্যান্য জেলার তুলনায় বড় হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেশি। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ের ঘনত্ব যথেষ্ট কম (০.৩৫ স্কুল/বর্গ কিমি)। পশ্চিম জেলায় মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৬১ যার ৪৬ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৩ শতাংশ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১৬ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই জেলায় বিদ্যালয়ের ঘনত্ব ০.৬৭ স্কুল প্রতি বর্গ কিমিতে যা অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেকটাই বেশি। সর্বনিম্ন ৩৩২টি বিদ্যালয় আছে উনকোটি জেলায় যার মধ্যে ৩০টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮১টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নবগঠিত সিপাহিজলা, গোমুতি, উনকোটি জেলায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৫৪, ৫৮৬, ৪৮৩ ও ৩৩২। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৫৯ যা ৩৪৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫৮টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০১ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৫৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে গড়ে প্রায় ৫৭৮টি বিদ্যালয় অবস্থিত।

সর্বাধিক ১৮.৮৬ শতাংশ বিদ্যালয় ধলাই জেলায় অবস্থিত। পশ্চিম, দক্ষিণ, গোমুতি, সিপাহিজলা, খোওয়াই, উত্তর ও উনকোটি জেলায় যথাক্রমে ১৪.২৮, ১৪.২৪, ১২.৬৬, ১১.৯৭, ১০.৩৭ ও ৭.১৭ শতাংশ বিদ্যালয় অবস্থিত। আপেক্ষিকভাবে জেলাগুলির আয়তন ও জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলি সমবণ্টিত বলেই মনে হয়। নব গঠিত জেলাগুলির মধ্যে উনকোটি জেলায় বিদ্যালয়ের হার অপেক্ষাকৃত কম। প্রায় ৫,৭১,৬১৩ শিশু প্রতিদিন 'মিড ডে মিল' প্রকল্পের সুবিধা পায় যা তাদের আরও অনেক বেশি বিদ্যালয়মুখী করে তুলেছে।

১০০ শতাংশ স্বাক্ষরতাই রাজ্যের একমাত্র লক্ষ্য সেই উদ্দেশে বিদ্যালয়গুলির সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে ত্রিপুরা সরকার। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাজ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ৮৭.২২ শতাংশ যা ভারতবর্ষের প্রথম পঞ্চম সাক্ষরতম রাজ্য। ২০১৩ সালের অগাস্ট মাসে ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, কলকাতা-র দেওয়া তথ্যানুসারে ত্রিপুরায় সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৯৫.১৬ যা নিঃসন্দেহে শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যের একটি বড় সাফল্য।

বিগত দশকগুলিতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা যথেষ্ট উন্নতি করেছে। রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় উন্নতি করেছে। ২২টি সাধারণ স্নাতক মহাবিদ্যালয়, ২টি মেডিক্যাল কলেজ, একটি করে কৃষি, মৎস্য, সংগীত, চারু ও কলা, ভেষজ এবং শরীর শিক্ষা মহাবিদ্যালয় রাজ্যের উচ্চশিক্ষার আঙ্গিকে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা পালন করে।

তথ্য-প্রযুক্তি ও পেশাদারি শিক্ষায় রাজ্য যথেষ্ট উন্নতি করেছে, ত্রিপুরায় একটি জাতীয় তথ্য-প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ২০১২-১৩ সালে ১২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারতীয় তথ্য-প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৪. স্বাস্থ্য

২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'—১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

সারণি-৭

স্বাস্থ্য সূচক	ত্রিপুরা	ভারত
জন্মহার	১৩.৭/১০০০	২১.৪/১০০০
মৃত্যুহার	৪.৭/১০০০	৭.০/১০০০
স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার	৯.০/১০০০	১৪.৪/১০০০
শিশু মৃত্যুর হার	২৬/১০০০	৪০/১০০০
মোট জন্মহার	১.৭	২.৫
লিঙ্গ বৈষম্য	৯৬০/১০০০	৯৪৩/১০০০

উৎস : জাতীয় পরিবার ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা, ভারত সরকার, ২০১৩

সারণি-৮

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো	সংখ্যা
হাসপাতাল	২৩
গ্রামীণ হাসপাতাল	১৮
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৮৪
উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১১০১
রক্ত ভাণ্ডার	০৮
রক্ত সঞ্চয় কেন্দ্র	০৭

উৎস : স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩-১৪

এই ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষও স্বাক্ষর করেছিল। কিন্তু পাশের শ্রীলঙ্কাও তার দেশের নাগরিকদের বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য-পরিষেবা দিচ্ছে। শুধু চিকিৎসা খরচ মেটাতে প্রতি বছর ৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোক দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যাচ্ছে। শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের মতে ধনী থেকে গরিব সকলকে বিন্যমূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হলে ২০১৭ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাড়িয়ে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২.৫ শতাংশ করতে হবে। গরিব থেকে গরিবতম মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পৌঁছে দেওয়াই রাজ্য সরকারের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে গুণগত মানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, তপশিল জাতি-উপজাতি ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পৌঁছে দেওয়া, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্প রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করেছে। কিন্তু এখনও বহু গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবার চিত্র ভালো নয়। ভূমিরূপ, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, ডাক্তার অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের সমস্যা এখানে যথেষ্ট।

সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় ত্রিপুরার নিম্ন জন্মহার, নিম্ন স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ও নিম্ন লিঙ্গ বৈষম্য। চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতি নির্দেশ করে নিম্ন মৃত্যুহার যা জাতীয় সূচকের থেকে যথেষ্ট কম।

বর্তমানে রাজ্যে ২৩টি সরকারি হাসপাতাল, ১৮টি গ্রামীণ হাসপাতাল, ৮৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১১০১টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৮টি রক্ত ভাণ্ডার, ৭টি রক্ত সঞ্চয় কেন্দ্র এবং দু'টি মেডিক্যাল কলেজে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে থাকে। তবু রাজ্যের বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য শিলচর বা জিরিবামে বা ভেলোর বা কলকাতায় যেতে বাধ্য হন। রাজ্যের চিকিৎসায় মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো যেমন—জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু বা প্রসূতির মৃত্যু, গড় আয়ু সব ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বের অন্য রাজ্যের তুলনায় ভালো জায়গায় রয়েছে। তৎসত্ত্বেও বহু মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য

চিত্র-৫
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো

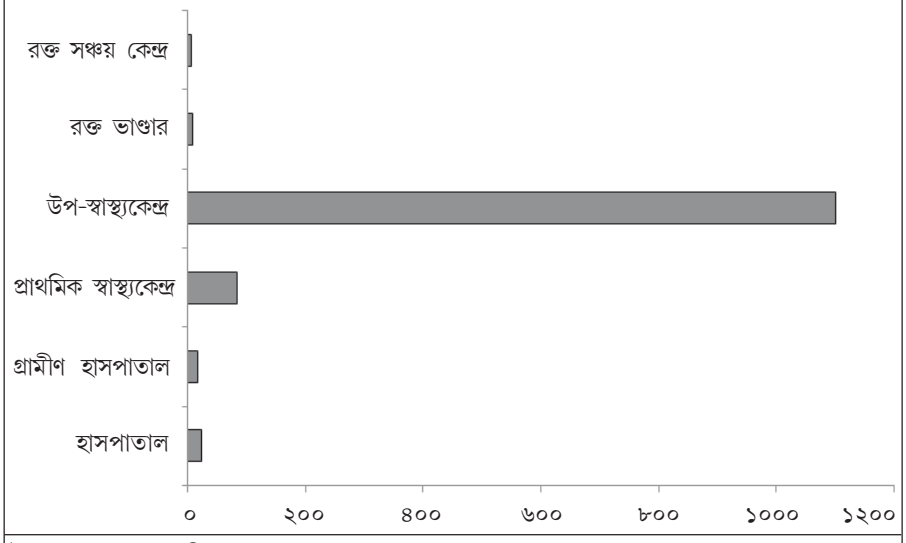

উৎস : স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার, ২০১৩

পরিষেবার জন্য দেশের অন্যান্য স্থানে যান। এর একটা বড় কারণ হল রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে ভরসাহীনতা এবং অন্য স্থানের চিকিৎসা পরিকাঠামো, রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতি বিষয়ে পরিতৃপ্তি লাভ।

৫. পরিবহণ পরিষেবা

ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ত্রিপুরা সংযুক্ত হয়েছে আসামের মধ্যে দিয়ে লুমডিং এবং শিলচর পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রডগেজ রেলওয়ে লাইন দ্বারা। ত্রিপুরার প্রধান রেল স্টেশনগুলি হল আগরতলা, কুমারঘাট এবং ধর্মনগর। এছাড়া ৪৪ জাতীয় সড়কও ত্রিপুরাকে অসম সহ সমগ্র ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

ত্রিপুরায় এখন রেল পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ। ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা বেহাল। আগরতলা বিমানবন্দর হল এ রাজ্যের একমাত্র বিমানবন্দর এবং এখান থেকে কলকাতা, গুয়াহাটি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং দিল্লির উদ্দেশে নিয়মিত উড়ান রওনা দেয়। আগরতলা-কলকাতা বা আগরতলা-গৌহাটি উড়ান পথে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও বিস্তৃতির প্রয়োজন আছে। ২০১৩ সালে আগরতলা বিমানবন্দর দিয়ে ৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছেন। ২০১৪ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লক্ষ। বাংলাদেশ সরকারও আগরতলায় উড়ান চালাতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে আগরতলার সিঙ্গারবিল বিমানবন্দরের গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে।

ভারতের প্রধান টেলিযোগাযোগ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির অধিকাংশই ত্রিপুরা রাজ্যে উপস্থিত এবং এগুলি রাজধানী সহ রাজ্যের অন্যান্য অংশে দূরভাষ এবং ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদান করে।

৬. শহরোন্নয়ন

২০১১ সালে তথ্যানুসারে ত্রিপুরার শহরগুলির মোট জনসংখ্যা ৯,০৬,৯৮১ জন। এর মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ বসবাস করে আগরতলা শহরে। রাজ্যের ২৬.১৭ শতাংশ মানুষ শহরবাসী। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে বর্তমানে রাজ্যে মাত্র একটি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ১০টি মিউনিসিপাল কাউন্সিল ও নয়টি নগর পঞ্চায়েত আছে। শহরমুখী জনসংখ্যার চাপ, যানবাহনের আধিক্য, পানীয় জলের চাহিদা, বিদ্যুতের ক্রমঊর্ধ্বমান চাহিদা, অপর্যাপ্ত পয়প্রণালীর কারণে নগরিক পরিষেবা ব্যাহত হয়। রাজ্যের শহরগুলির উন্নয়নের খাতে রাজ্য সরকার ২০১৩-১৪ সালের অর্থবর্ষে প্রায় ২৪,৩১০.৫৫ টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্য সরকারের কয়েকটি দপ্তর যেমন, নগর ও

সড়ক উন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ প্রচেষ্টা শহরবাসীকে সর্বাধিক নাগরিক পরিষেবা প্রদানে সচেষ্ট। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি প্রকল্প যেমন, জওহরলাল নেহরু জাতীয় শহর পুনর্নবীকরণ প্রকল্প পরিকাঠামো ও শাসন প্রকল্প, দারিদ্র শহরবাসী সহায়তা প্রকল্প অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যের শহরোন্নয়নে সহায়তা করেছে।

উপসংহার

১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর 'স্বাধীন রাজ্য' ত্রিপুরা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫৬ সাল থেকে স্বাধীন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রূপে গণ্য হয়। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি ত্রিপুরা স্বাধীন অঙ্গরাজ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দেশভাগের পর বহু মানুষ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে, ভারতে বসবাসের উদ্দেশ্যে আগমন করে। ভূ-প্রকৃতিগত অবিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এই বিভাজনে ত্রিপুরার সম্পদ গঠনে/নির্মাণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ছিন্নপ্রায় মানুষরা সামান্য সংস্থান নিয়ে এ দেশে এসে বসবাস শুরু করে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং জমি-মানুষ সম্পর্কের মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটে। উপরন্তু বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র-নির্ভর সম্পর্কের কারণে এই রাজ্যের উন্নয়নের গতি ধীর। সাধারণ খনিজসম্পদের অভাবহেতু, যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা, সময়, দূরত্বের কারণে দামবৃদ্ধি, অনেক দ্রব্যের পচনশীলতা প্রভৃতি কারণে উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে একদিকে অঞ্চলটির গুরুত্ব রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে একই কারণে সমস্যাক্রান্ত।

তথ্যালোচনার ভিত্তিতে বলা যায় বিংশ শতকের শেষ দশক থেকে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা নিজেকে সর্বভারতীয় স্তরে উন্নত করেছে। শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষিতের হার ৮৭.৭৫ শতাংশ পরিবর্তনশীল ত্রিপুরাকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুশিক্ষিত এই জনগণের প্রয়োজন। নতুনভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের (মোট ৪৯টি কাজ) এর মধ্যে রাজ্য সরকার ৪২টি কাজ গ্রহণ করেছে। যেমন—হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারি, শপিং কমপ্লেক্স, পানীয় জল, শৌচাগার, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি। ৪৯টি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মোট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। রাজ্যে প্রায় ১১০০ গ্রাম পঞ্চায়েত, ভিলেজ কমিটির অধিকাংশ কাঁচা-পাকা রাস্তা তৈরি হয়েছে। রাজ্যের শহরোন্নয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আগরতলাকে স্মার্ট সিটি হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তাবনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ শহরের গঠন চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে পারে। রেলমন্ত্রকের তথ্যানুসারে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যে রেল পরিষেবা চালু করা হবে। আশা করা যায়, উত্তরে চুরাইবাড়ি থেকে দক্ষিণে উদয়পুর পর্যন্ত প্রায় ১৯৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেল পরিষেবা রাজ্যের উন্নয়নে অন্যমাত্রা যোগ করবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়েই রাজ্যের আরো অধিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।❑

[লেখকদ্বয় যথাক্রমে অধ্যাপক ও গবেষক, ভূগোল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, সূর্যমণিনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯০২২।]

গ্রন্থপঞ্জি :

1. 5th Economic Census, Tripura (2010) Directorate of Economics & Statistics, Planning (Statistics) Department, Govt. of Tripura, Agartala.
2. Economic Review of Tripura 2013-14 (2014) Directorate of Economic and Statistics, Department, Government of Tripura, Agartala.

এবারও সাফল্যে No.1

Toppers of all the deptts. are from Academic Association

WBCS 2014	
গ্রুপ	সাফল্য
Gr.-A	29
Gr.-B	14
Gr.-C	64 +
মোট	107+

WBCS 2014 Gr. C (Result Published on 15.03.16)

ইন্টারভিউ ঃ WBCS-2015 তেই হোক স্বপ্নপূরণ

"ইন্টারভিউ হল লুডোর ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। এটিকে অতিক্রম করতে না পারলে আবার শূণ্য থেকে শুরু — তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি"।

ইন্টারভিউ ক্লাসে ভর্তি চলছে

আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত করতে এখানে যা পাবেন— ● IAS-2015, WBCS-2014, 2013, 2012, 2011 ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এমন ১৫০০+ প্রশ্ন। ● কমপ্লিট স্টাডি কিট। ● অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং WBCS টপারদের সামনে প্রচুর মক ইন্টারভিউ। ● আই. এ. এস- টপারদের ইন্টারভিউয়ের 'সাকসেস ফান্ডা'। ● ইন্টারভিউ সম্পর্কে ডব্লুবিসিএস টপারদের অভিজ্ঞ মতামত। ● CTO/ACTO, BDO/Jt BDO এবং DSP কে প্রথম চয়েস দেওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি।● ইংরাজিতে কথা বলার দুর্বলতা দূরীকরণের উপায়। এবং আরোও অনেক কিছু...............

স্ট্রেস, বিহেভিওরাল, নর্ম্যাল–সবধরনের ইন্টারভিউ দিতে পেরেছি এখানে

Executive (WBCS-2014)

বি.টেক -এর ছাত্রী হওয়ায় আমার ক্ষেত্রে প্রায় সব বিষয়ই নতুন। প্রচন্ড উৎসাহ নিয়ে পড়াশুনো শুরু করে প্রথমবারেই আমি ডব্লুবিসিএস এক্সিকিউটিভ এর লিস্টে নিজের নাম খুঁজে পেয়েছি এবং ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিকে সবরকম ভাবে পাশে পেয়েছি। স্ট্রেস, বিহেভিওরাল, নর্ম্যাল—সবরকমের ইন্টারভিউ দিতে পেরেছি এখানে। শুধু বাংলা, শুধু ইংরাজী অথবা বাংলা ইংরাজী সব মাধ্যমেই ইন্টারভিউ দেওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানে এসেই। তাই ইন্টারভিউতে আমার এই সাফল্যের জন্য অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

■ নির্মিতা সাহা

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের **'Inclusive Postal Course'**। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস্। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাশটেস্ট, মকটেস্ট এবং প্রতিটি বিষয়ের কোশ্চেনব্যাঙ্ক। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞ রা সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।**

WBCS 2017 ব্যাচে ভর্তি চলছে

Academic Association

9038786000
9674478644

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in ✱ Uluberia-9051392240 ✱ Barasat-9800946498
✱ Berharampur-9474582569 ✱ Birati-9674447451 ✱ PaschimMedinipur-9474736230

উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন শিল্পের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

কয়েকটা রাজ্যের পর্যালোচনা

উত্তর-পূর্ব ভারত—দুর্গম হলেও প্রাকৃতিক শোভা ও বৈচিত্রের কোনও অভাব নেই এই অঞ্চলে। আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামের পর্যটনস্থল ও পর্যটনশিল্পে সামগ্রিক চিত্রটা তুলে ধরছেন **রবীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী।**

কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের বিজ্ঞাপনে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বলা হয়েছে 'PARADISE UNEXPLORED' বা অনাবিষ্কৃত স্বর্গ। এই শ্রুতিমধুর এবং অর্থবহ বিশেষণটি নিয়ে তর্কের অবকাশ নেই, কারণ বিভিন্ন আদিবাসী এবং উপজাতীয় মানুষদের বাসভূমি উত্তর-পূর্ব ভারতের চিত্তাকর্ষক প্রাকৃতিক শোভা এবং অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র যে কোনও পর্যটককে গভীর তৃপ্তি দেবে। এ সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে পর্যটকদের উপস্থিতি যে বেশ কম তার কারণটিও সবার জানা। এই অঞ্চলে সপরিবারে বেড়াতে যাওয়া কতখানি নিরাপদ তাই নিয়ে ভ্রমণরসিকদের মনে রয়েছে সংশয় আর সন্দেহ। বাস্তব ঘটনা হল উগ্রপন্থী কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য মাঝে মধ্যে উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও তা পর্যটকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে না। হঠাৎ ডাকা বন্‌ধ এবং পথ অবরোধের মতো ঘটনায় পর্যটকদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে, তার চেয়ে বেশি কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্যকে বলা হয় সেভেন সিস্টার্স বা সাত বোন। এরা হল আসাম, অরুণাচলপ্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা। সাম্প্রতিককালে সিকিম রাজ্যটিকেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্যরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

এই নিবন্ধে আমরা উত্তর-পূর্বের কয়েকটি রাজ্যের পর্যটন শিল্পসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, সেই রাজ্যের উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করব এবং রাজ্যগুলির পর্যটন শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে একটা ধারণায় পৌঁছতে সচেষ্ট হব।

আসাম

উত্তর-পূর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটির নাম আসাম। আসামের রাজধানী শহর গুয়াহাটিকে বলা হয় উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার। গুয়াহাটি থেকে সড়কপথে উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যের রাজধানীতে যাওয়ার জন্য রয়েছে সুপারফাস্ট এবং নির্ভরযোগ্য বাস পরিষেবা।

ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গুয়াহাটি অতি প্রাচীন জনপদ। অতীতে এর নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর এবং আসামের নাম ছিল কামরূপ। আসামের সবচেয়ে বড় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যটি হল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থল তিব্বতে। তিব্বতে তার পরিচিতি 'সাংপো' নামে। সাংপো নদী ভারতের অরুণাচলপ্রদেশে প্রবেশ করার পর নাম পেয়েছে সিয়াং। সিয়াং নদী আসামের সমতলভূমিতে নেমে আসার পর লোহিত, দিবাং, নোয়াডিহিং, সুবনসিরি এবং আরও বেশ কয়েকটি নদীর জলাধারায় পুষ্ট হয়ে এক মহানদের রূপ ধরে ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

আসামের ভেতর দিয়ে বয়ে চলার সময় ব্রহ্মপুত্র সৃষ্টি করেছে এক অনুপম প্রশস্ত নদী উপত্যকা। প্রতি বছর বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্রের জল দুকূল প্লাবিত করে এক বিশাল এলাকাকে জলমগ্ন করে তোলে। পরবর্তীকালে জল সরে যাবার পর সেই জমিতে সোনার ফসল ফলে। কৃষিজমির কাছে-দূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য চা বাগান। এই বাগানগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বহু ভাষা-ভাষি, বিভিন্ন জাতি-উপজাতিবিশিষ্ট বৈচিত্রময় আসাম। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি আসামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বর্ণময় করে তুলেছে। ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব উপলক্ষে পরিবেশিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুর্গাপুজো এবং বিহু উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যবাসীরা আনন্দে মেতে ওঠেন এবং এই উৎসবে শামিল হতে প্রচুর সংখ্যক পর্যটক আসামে এসে হাজির হন।

কামাখ্যা মন্দির : কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে গুয়াহাটি বা গৌহাটি নামটি পরিচিতি পেয়েছে কামাখ্যা মন্দিরের সৌজন্যে। এত বিখ্যাত সতীপীঠ আর দ্বিতীয়টি আছে কি না সন্দেহ। কামাখ্যা মন্দিরকে কেন্দ্র করে তন্ত্রসাধনার রহস্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে রয়েছে একরাশ কৌতূহল, ভয় এবং ভক্তি। গুয়াহাটি রেল স্টেশন থেকে নয় কিলোমিটার দূরে নীলাচল পাহাড়ের কোলে বিরাজমান কামাখ্যা মন্দিরে সারা বছরই ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে, বিশেষ করে অম্বুবাচি উৎসবের সময়।

মন্দির খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা এবং দুপুর ৩টে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কামাখ্যার বর্তমান মন্দির ভবনটির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের উদ্যোগে ১৬৬৫ সালে। মন্দিরের স্থাপত্যটি বেশ অভিনব। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামার পর ছোট

সিংহাসনে আসীন দেবীমূর্তির দর্শন পাওয়া যায়। তার নীচেই বহমান শীর্ণ জলধারার কাছেই রয়েছে লালকাপড়ে ঢাকা সতীপীঠ।

নীলাচল পাহাড়ের ওপরে রয়েছে ভুবনেশ্বরী মন্দির। পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে চড়ে এই মন্দিরে যাবার পথে চোখে পড়বে গুয়াহাটি শহর এবং ব্রহ্মপুত্র নদ।

উমানন্দ মন্দির : উমানন্দ মন্দিরের অবস্থান ব্রহ্মপুত্রের এক নদীদ্বীপের ওপর। দ্বীপের নাম পিকক আইল্যান্ড। এই দ্বীপটি বিশ্বের ক্ষুদ্রতম নদীদ্বীপ যেখানে স্থায়ীভাবে মানুষ বাস করে। উমানন্দ হলেন দেবী কামাখ্যার ভৈরব। গুয়াহাটির ফ্যান্সিবাজার ঘাট অথবা শুক্লেশ্বর ঘাট থেকে নৌকো চেপে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে উমানন্দ মন্দির দর্শন করতে যাওয়ার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ভোলার নয়।

বশিষ্ঠ আশ্রম : বশিষ্ঠ আশ্রম গুয়াহাটি রেল স্টেশন থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন এই স্থানে শাপগ্রস্ত দেহহীন বশিষ্ঠমুনি তপস্যা করে শাপমুক্ত হয়েছিলেন। পাহাড় থেকে নেমে আসা তিনটি ঝরনাধারা মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে বশিষ্ঠগঙ্গা। কাছেই রয়েছে বশিষ্ঠমুনি এবং শিবের মন্দির।

গুয়াহাটিকে মন্দিরের শহর বললে ভুল হবে না। শহরেই প্রায় প্রতিটি পাড়াতেই রয়েছে একাধিক মন্দির। গুয়াহাটির কয়েকটি বিশিষ্ট মন্দির হল উজানবাজারের কাছে অবস্থিত নবগ্রহ মন্দির, পানবাজার এলাকার শুক্লেশ্বর শিবমন্দির, গুয়াহাটি শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত প্রাচীন পাণ্ডুনাথের মন্দির, ইসকন মন্দির এবং বালাজি মন্দির।

গুয়াহাটি শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র, আসাম স্টেট মিউজিয়াম, গুয়াহাটি চিড়িয়াখানা, প্ল্যানেটোরিয়াম, নেহরু পার্ক এবং ফ্যান্সিবাজার মার্কেট।

গুয়াহাটি শহরকে কেন্দ্র করে অদূরবর্তী যেসব দর্শনীয় স্থান বেড়িয়ে আসা যায় তাদের নাম এবং সংক্ষিপ্ত তথ্য নীচে দেওয়া হল।

মদন কামদেব : গুয়াহাটি থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী মদন কামদেব মন্দিরগুচ্ছকে বলা হয় 'আসামের খাজুরাহো'। বড় এক টিলার ওপর ছড়ানো রয়েছে অহম রাজাদের উৎসাহে নির্মিত মন্দির স্থাপত্যের অসাধারণ সব নিদর্শন। ঐতিহাসিকদের মতে এই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে এখানকার অনেক পুরাকীর্তিই নষ্ট হয়ে গেছে তা সত্ত্বেও এখনও যা অবশিষ্ট তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। শুধুমাত্র ছেনি-হাতুড়ি সম্বল করে পাষাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন তখনকার ভাস্কররা। বিভিন্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা মূর্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট একটি মিউজিয়াম।

হাজো : গুয়াহাটি থেকে দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের কাছে হাজো এক পবিত্র তীর্থস্থান। হাজোর প্রধান দেবালয়টি হয়গ্রীব মাধব মন্দির নামে খ্যাত। সিঁড়ি দিয়ে প্রায় তিনশো ফুট উঁচুতে উঠে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের দেবতা নারায়ণের এক রূপ শ্রী হয়গ্রীব মাধব নামে হিন্দুদের কাছে পূজিত হন আর বৌদ্ধরা এই মূর্তিকে বুদ্ধদেবের এক অবতার জ্ঞানে পুজো করেন।

হাজোর পোয়া মক্কা মসজিদ মুসলমানদের কাছে এক পরমপবিত্র উপাসনাস্থল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবদেশ থেকে আগত এক মুসলিম সাধক পির গিয়াসুদ্দিন আউলিয়া এই অঞ্চলে কিছু দিন বাস করেন এবং তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় এই মসজিদ। মসজিদ তৈরি করার সময় পির সাহেব মক্কা থেকে আনা এক পোয়া পবিত্র মৃত্তিকা মসজিদের ভিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। তাই মুসলিম ভক্তদের বিশ্বাস মক্কায় হজ করে যে পুণ্য হয় তার এক-চতুর্থাংশ পুণ্য হয় এই মসজিদে এসে নমাজ পড়লে।

শুয়ালকুছি : গুয়াহাটি থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শুয়ালকুছি গ্রামে তাঁতিদের বাস। বংশপরম্পরায় অর্জিত দক্ষতার এখানকার বয়নশিল্পীরা রেশম, মুগা আর সোনালি পাট দিয়ে তৈরি করে চলেছেন সূক্ষ্ম কারুকাজ করা অপরূপ সব বস্ত্রসম্ভার। চোখের সামনে সমানতালে পুরুষ এবং মহিলা কারিগরদের কাজ করতে দেখাও এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

মাজুলি দ্বীপ এবং ঐতিহাসিক নগর শিবসাগর : আসাম রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। এদের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট নাম হল মাজুলি এবং শিবসাগর।

ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর অবস্থিত মাজুলি বিশ্বের বৃহত্তম নদীদ্বীপ রূপে স্বীকৃত। এই 'বৃহত্তম নদীদ্বীপ' শিরোপাটি একটি ভৌগোলিক তথ্য ছাড়া আর কিছু নয়। মাজুলির আসল গুরুত্ব অন্য জায়গায়। গত পাঁচ শতাব্দী ধরে নদীবেষ্টিত এই ভূখণ্ডটি আসামের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক রাজধানী রূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এই মাজুলি দ্বীপে তাঁর ভিন্নতর বৈষ্ণব ধারার প্রচার শুরু করেছিলেন। তিনি যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলেছিলেন তা 'সত্র' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রতিটি সত্র হল একেকটি বৈষ্ণবীয় মঠ। আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে কঠোর আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে হয় সত্রের আবাসিকদের। সত্রের বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ধর্ম ছাড়াও আসামীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত, নৃত্য, নাটক এবং সাহিত্যের চর্চাও করতে হয়।

এক সময় মাজুলি দ্বীপের আয়তন ছিল প্রায় এক হাজার বর্গকিলোমিটার। নদী ভাঙনের ফলে দ্বীপের অনেকটা অংশই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এক সময়ে মাজুলিতে ৬৪টি সত্র ছিল, পরবর্তীকালে বেশ কিছু সত্র ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে ধ্বংস হয়ে গেছে, আবার কিছু সত্রকে ডিব্রুগড় বা যোরহাটের মতো শহরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সমগ্র আসাম জুড়েই ছড়িয়ে আছে সত্রের 'শরণীয়া' বা গৃহী শিষ্যরা। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে মানুষ এসে উপস্থিত হন মাজুলি দ্বীপে।

মাজুলির প্রাকৃতিক শোভাও কম আকর্ষণীয় নয়। দ্বীপের ভেতরে ছড়িয়ে থাকা জলাশয়গুলিতে শীতের মরশুমে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এসে আশ্রয় নেয়।

শিবসাগর : আসামের ইতিহাসে শিবসাগর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অহম রাজারা দীর্ঘ ছয় শতাব্দী ধরে আসামে রাজত্ব করেছেন। তাঁদের শাসনের অবসান

ঘটে ১৮২৬ সালে যখন ইংরেজরা তাদের রাজ্য অধিকার করে নেয়।

অহম রাজাদের রাজধানী ছিল রঙ্গপুর যা পরবর্তীকালে শিবসাগর নামে পরিচিতি লাভ করে।

শিবসাগর এবং তার কাছাকাছি এলাকায় ছড়িয়ে আছে অহম রাজাদের নানান কৃতি। শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য হল শিবসাগর দিঘির পাশে বিরাজমান বিশাল শিবমন্দির যা শিবডোল নামে বিখ্যাত। এত উঁচু শিবমন্দির ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই বলে দাবি করা হয়। এখানকার অন্যান্য দিঘিগুলিও অহম রাজাদের আমলে খনন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে জয়সাগর, গৌরীসাগর এবং রুদ্রসাগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শহরের মধ্যেই সুন্দর এক উদ্যানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রঙ্গঘর। রাজা প্রমত্ত সিংহের আমলে তৈরি এই দ্বিতল ভবনটির নির্মাণশৈলী বেশ অভিনব। এর দোতলার বারান্দা থেকেই রাজা সপারিষদ হাতির লড়াই এবং অন্যান্য প্রমোদানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতেন।

শিবসাগর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গরগাঁও ছিল অহম রাজাদের আর এক প্রাচীন রাজধানী। এখানে সাততলা এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন রাজা রাজেশ্বর সিংহ। কারেঙ্ঘর নামে পরিচিত এই প্রাসাদের চারটি তলাই নাকি মাটির নীচে। ভূতল কক্ষে সুড়ঙ্গ পথের ব্যবস্থা ছিল অপ্রত্যাশিত শত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে।

শিবসাগরের কাছে আরও একটি অভিনব দর্শন বিশালাকার ভবন দর্শকদের বিস্মিত করে। তলাতলঘর নামেই এর পরিচিতি। রাজা রুদ্রসিংহ তাঁর দেহরক্ষীদের বাসস্থান রূপে ১৬৯৯ সালে তৈরি করেন এই সেনানিবাস।

শিবসাগরের অহম মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে পুরানো অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, মূর্তি এবং আরও বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী। পর্যটকরা ইচ্ছে করলে দেখে আসতে পারেন অহম রাজাদের আমলে তৈরি নামডাং স্টোন ব্রিজ, চরাইদেও মহিদাম এবং আজান পিরের দরগা।

আসামের জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্য : বনভ্রমণ এবং বন্যপ্রাণী দর্শন যাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তাদের কাছে আসাম এক আদর্শ গন্তব্য। এই রাজ্যে ছড়িয়ে আছে বেশকিছু জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্য যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল কাজিরাঙা, মানস, ওরাং, নামেরি এবং ডিব্রু সাইখোয়া ন্যাশনাল পার্ক আর পবিতোরা, বুড়াচাপোরি, লাওখোয়া, সোনাই-রূপাই এবং চক্রশিলা অভয়ারণ্য।

এদের মধ্যে কয়েকটিকে বেছে নিয়ে তাদের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য নীচে পরিবেশিত হল।

কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান : ভারতবর্ষে জাতীয় উদান এবং অভয়ারণ্যের অভাব নেই। কিন্তু কাজিরাঙার তুলনা মেলা ভার। ঘনসবুজ বিস্তৃত অসমতল প্রান্তরে গাছপালায় ঘেরা ছোট-বড় জলাশয়ে পরিযায়ী পাখিদের সংসার, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা ১৬-১৭ ফুট উঁচু এলিফ্যান্ট গ্রাসের বন, উত্তর দিগন্তে অরুণাচলের নীলাভ পাহাড়শ্রেণির শোভা আর জঙ্গলে হাতি, গন্ডার, বুনো মোষ, বাঘ, বুনোশুয়োর এবং হরিণের মতো প্রাণীদের অবাধ বিচরণ, সব মিলিয়ে প্রকৃতিপ্রেমিক ভ্রমণরসিকদের কাছে কাজিরাঙা এক অবশ্য দ্রষ্টব্য জাতীয় উদ্যান।

কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কের আয়তন ৪৩০ বর্গকিলোমিটার। এই অরণ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাণীটি হল একশৃঙ্গবিশিষ্ট ভারতীয় গন্ডার। হাতির পিঠে চেপে বনভ্রমণের সময় গন্ডারদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ মেলে। এছাড়া রয়েছে জিপ সাফারির ব্যবস্থা।

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙার প্রবেশদ্বার কোহরা ২১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গুয়াহাটি থেকে যোরহাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া বা নামসাই যাবার সুপারফাস্ট বাসগুলি কাজিরাঙা সংলগ্ন ৩৭ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। প্রয়োজনে গুয়াহাটি থেকে গাড়ি ভাড়া করেও কাজিরাঙা ঘুরে আসা যায়। কাজিরাঙার জঙ্গল খোলা থাকে ১ নভেম্বর থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত।

মানস ন্যাশনাল পার্ক : মানস জাতীয় উদ্যানের প্রায় মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে মানস নদী। নদীর উত্তর দিকে ভুটান আর অপরদিকে ভারত।

জীব এবং উদ্ভিদ বৈচিত্রের দিক দিয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই অরণ্য। এই কারণেই ১৯৮৮ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) একে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। মানস জাতীয় উদ্যানের নিকটতম রেল স্টেশনটির নাম বারপেটা রোড। স্টেশন থেকে মানসের কোর এরিয়ায় অবস্থিত মাথানগুড়ি বনবাংলোর দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে স্বীকার করতেই হবে যে মাথানগুড়ি বনবাংলো ভারতের অন্যতম সেরা অরণ্যনিবাস। ছোট্ট টিলার ওপর অবস্থিত বনবাংলোর বারান্দা থেকে চোখে পড়ে ভুটানের পাহাড়, জঙ্গল আর নদী। বাংলোর সামনেই মানস নদী দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে এক অপরূপ ছন্দে।

মানস ন্যাশনাল পার্কের কয়েকটি বিখ্যাত প্রাণীর নাম হল গোল্ডেন লাঙ্গুর, পিগমি হগ, বিন্টুরং, হিসপিড হেয়ার, ক্লাউডেড লিওপার্ড এবং মানস নদীর ভোঁদড়। জঙ্গলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রাণীরা হল বাঘ, চিতাবাঘ, বুনো মোষ, ক্যাপড লাঙ্গুর, বার্কিং ডিয়ার, হগডিয়ার, সম্বর, গোল্ডেন ক্যাট, হাতি, গাউর এবং অসংখ্য প্রজাতির পাখি আর বিভিন্ন ধরনের সরীসৃপ।

মানস অরণ্যে ঘোরার জন্য বনদপ্তর আয়োজিত এলিফ্যান্ট রাইডের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া গাড়িতে চড়েও জঙ্গল সাফারি করা যায়।

পবিতোরা অভয়ারণ্য : গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৫৩ কিলোমিটার দূরবর্তী এই অভয়ারণ্যের আয়তন মাত্র ৩৯ বর্গকিলোমিটার হলেও এখানে গন্ডারের সংখ্যা ৮০ ছাড়িয়েছে। গন্ডার ছাড়া বুনোমোষের সংখ্যা কম নয়। এখানে হাতির পিঠে চেপে ঘুরে বেড়ালে চোখে পড়বে আরও বেশকিছু বন্যপ্রাণী। যেমন, হগডিয়ার, বুনোশুয়োর, সিভেট ক্যাট, বনবিড়াল এবং একাধিক প্রজাতির কচ্ছপ। শীতের মরশুমে অভয়ারণ্যের জলাভূমিতে বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখিরা এসে হাজির হয়।

এক নজরে আসামের পর্যটন শিল্প : আসাম রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। দু' দশক আগেও উপযুক্ত

পরিকাঠামোর অভাবে অধিকাংশ পর্যটনকেন্দ্রে বহিরাগত ভ্রমণার্থীদের উপস্থিতি ছিল বেশ কম। পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে পর্যটন শিল্পের সার্বিক চিত্রটি অনেকটা উজ্জ্বল।

পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে স্বল্পখ্যাত পর্যটনকেন্দ্রগুলিতেও ট্যুরিস্ট লজ তৈরি হওয়াতে বহিরাগত ভ্রমণরসিকরা এখন সেই সব জায়গাতেও রাত্রিবাস করছেন। এর ফলে স্থানীয় মানুষজন পরোক্ষে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন।

সাম্প্রতিককালের দুটি ঘটনা রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে। প্রথমটি হল লামডিং-শিলচর মিটারগেজ রেললাইনটিকে অতি সম্প্রতি ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এর ফলে অতি সহজেই পর্যটকরা এখন গুয়াহাটি থেকে শিলচর যেতে পারবেন। এই পথেই পড়বে হাফলং নামের পাহাড়ি শহর। প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন হাফলং যে কোনও পর্যটককে মুগ্ধ করবে। গুয়াহাটি-শিলচর রেলপথের লামডিং-শিলচর অংশটি অপার বৈচিত্রে ভরা। দিনেরবেলায় এই পথে যাবার সময় চোখে পড়বে আদিম অরণ্য, খরস্রোতা নদী আর উত্তর কাছাড় পার্বত্য ভূমির অপরূপ শোভা।

রাজ্য পর্যটন শিল্পের উন্নতির পক্ষে অনুকূল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হল বিস্তীর্ণ ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ধওলাঘাট-সদিয়া সেতুটির নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষের দীর্ঘতম এই নদী-সেতুটি তৈরি হবার ফলে উত্তর-পূর্ব অরুণাচল এবং উজানি আসামের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পর্যটকরা সহজেই ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া থেকে উত্তর-পূর্ব অরুণাচলের তেজু, রোয়িং ইত্যাদি শহরে যেতে পারবেন।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে, বিশেষ করে আসামে,পর্যটন শিল্পের বিকাশের পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন কারণে ঘন ঘন বন্‌ধ, যখন-তখন সকড়পথ বা রেলপথ অবরোধ। বলাবাহুল্য এই সব ঘটনা সর্বভারতীয় পর্যটকমহলে ভুল বার্তা বহন করে। এই বিষয়টি নিয়ে প্রতিটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনগুলিকে একমত হতে হবে যে আন্দোলনের সময় বহিরাগত এবং ভ্রমণরত পর্যটকরা যেন সমস্যায় না পড়েন।

পর্যটন শিল্পের বিকাশের একটি প্রধান শর্ত হল তা যেন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক হয়। পর্যটন শিল্পের উন্নতি হলে আরও বেশি করে তরুণ-তরুণীরা এই শিল্পের সঙ্গে বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজে পাবেন।

অরুণাচলপ্রদেশ

আয়তনের দিক থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহত্তম রাজ্যটির নাম অরুণাচলপ্রদেশ। অরণ্য-প্রধান, জনবিরল এবং বিভিন্ন উপজাতীয় মানুষদের বাসভূমি অরুণাচলকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, পূর্ব অরুণাচল, মধ্য অরুণাচল এবং পশ্চিম অরুণাচল।

অরুণাচলপ্রদেশের পর্যটন শিল্প প্রধানত পশ্চিম অরুণাচলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। মধ্য এবং পূর্ব অরুণাচলে পর্যটকদের উপস্থিতি অতি নগণ্য। এর প্রধান কারণটি হল অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর অভাব।

অরুণাচলপ্রদেশে যেতে হলে ইনার লাইন পারমিট লাগে। ইনার লাইন পারমিটের জন্য দরখাস্ত করার সময় ভোটার পরিচয়পত্র এবং তার জেরক্স কপি সঙ্গে রাখবেন।

পশ্চিম অরুণাচলের তিনটি পর্যটনকেন্দ্র হল, বমডিলা, দিরাং এবং তাওয়াং।

গুয়াহাটি থেকে সড়কপথে বমডিলার দূরত্ব ৩৪২ কিলোমিটার। গুয়াহাটি থেকে সুপারফাস্ট বাসে অথবা গাড়ি ভাড়া করে সরাসরি যাওয়া যায়, আবার ইচ্ছে করলে তেজপুর শহরে একটা রাত কাটিয়ে পরদিন পৌঁছে যাওয়া যায় ১৬১ কিলোমিটার দূরবর্তী বমডিলায়।

তেজপুর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভালুকপং হল অরুণাচলপ্রদেশের অন্যতম প্রবেশদ্বার। এখানেই ইনার লাইন পারমিট দেখাতে হয়। ভালুকপং থেকে ৫ কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই টিপি নামের জায়গায় রয়েছে অর্কিড রিসার্চ সেন্টার। টিপি থেকে রওনা দিয়ে জিরো পয়েন্ট, নাগমন্দির, টেঙ্গা হয়ে গাড়ি পৌঁছবে ৮২০০ ফুট উঁচু 'মেঘের দেশ' বমডিলা শহরে।

বমডিলার দর্শনীয় স্থানগুলি পায়ে হেঁটেই দেখে নেওয়া যায়। শহরের বাজার এলাকায় রয়েছে 'লোয়ার মনাস্ট্রি' নামে পরিচিত বুদ্ধ মন্দির, ক্র্যাফ্‌ট সেন্টার এবং উপজাতীয় লোক-সংস্কৃতির সংগ্রহশালা। 'আপার মনাস্ট্রি' নামে পরিচিত, সাম্প্রতিককালে নির্মিত বৌদ্ধ গুম্ফাটির অবস্থান বমডিলা শহরের প্রায় মাথায়।

বমডিলা থেকে তাওয়াং যাবার পথে ৪২ কিলোমিটার দূরে দিরাং নামের ছোট্ট পাহাড়ি শহর। সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায়, প্রশস্ত নদী উপত্যকার ধারে অবস্থিত এই শহরটির প্রাকৃতিক শোভা মনোমুগ্ধকর। এখানে একটা দিন থাকলে দেখে নেওয়া যাবে ইয়াক রিসার্চ সেন্টার শিপ ব্রিডিং ফার্ম, ফলের বাগান এবং সাংতি গ্রাম। দিরাং থেকে তাওয়াং যাবার পথেই দেখা যাবে উষ্ণপ্রস্রবণ।

দিরাং থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরবর্তী তাওয়াং যাওয়ার পথে অতিক্রম করতে হবে বিখ্যাত সেলা পাস, উচ্চতা ১৩৭২১ ফুট। যশবন্তগড়ে রয়েছে বীর সৈনিক যশবন্ত সিং রাওয়াতের স্মৃতি মন্দির। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে ইনি নিজের প্রাণের বিনিময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেনাচৌকি দীর্ঘ সময় ধরে আগলে রেখেছিলেন।

যশবন্তগড় থেকে তাওয়াং যাবার পথে দেখে নেওয়া যাবে নূরানাং জলপ্রপাত। ভারতের সবচেয়ে সুন্দর শৈলশহরগুলির অন্যতম তাওয়াং শহরের উচ্চতা ১০২০০ ফুট। মনপা উপজাতীয় মানুষরাই এই অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। মনপারা অত্যন্ত ধর্মভীরু, কর্মঠ এবং অতিথিবৎসল।

তাওয়াং শহরের প্রধান আকর্ষণ হল চারশো বছরের প্রাচীন বৌদ্ধমঠ। প্রধান বুদ্ধ মন্দিরে রয়েছে ২৬ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি। তাওয়াং মনাস্ট্রির সংগ্রহশালাটি সত্যিই দেখার মতো। তাওয়াং মঠ থেকে তাওয়াং শহর এবং দূরের নদী উপত্যকার শোভা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। তাওয়াং মঠের কিছুটা দূরেই রয়েছে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মঠ আন্নিগুম্ফা। তাওয়াং শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য হল ক্র্যাফ্‌ট

সেন্টার, সেল্‌স এম্পোরিয়াম এবং ওয়ার মেমোরিয়াল।

তাওয়াং থেকে গাড়ি ভাড়া করে ঘুরে আসা যায় পিটিসো লেক (১৬ কিলোমিটার) এবং সাঙ্গেস্টার লেক (৪২ কিলোমিটার) এছাড়া সেনাবাহিনীর অনুমতি নিয়ে বুমলা সীমান্ত এলাকা থেকেও বেড়িয়ে আসা যায়।

মধ্য অরুণাচলের প্রধান শহর এবং অরুণাচলপ্রদেশের রাজধানী ইটানগর আসামের তেজপুর থেকে ২১৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই দুটি শহর নির্ভরযোগ্য বাস পরিষেবা দ্বারা যুক্ত। তেজপুর থেকে ইটানগর যাবার সড়কপথটি ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর বরাবর পূর্ব দিকে চলে গেছে। সবুজ চা বাগান আর বিস্তীর্ণ কৃষিজমির পাশ দিয়ে এ এক অনিন্দ্যসুন্দর যাত্রাপথ। বান্দরদেওয়া চেকপোস্টে পথ দুভাগ হয়েছে। সোজা পথটি গেছে নর্থ লখিমপুরের দিকে আর উত্তরমুখী পথটি নাহারলাগুন হয়ে পৌঁছে গেছে ৩০ কিলোমিটার দূরবর্তী ইটানগরে।

ইটানগরের উচ্চতা বেশ কম, প্রায় ২৫০০ ফুট। যেহেতু রাজধানী শহর তাই অরুণাচলের পর্যটন মানচিত্রে ইটানগরকে স্থান দিতেই হয়। নচেৎ ইটানগর একটি বড় শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়। ইটানগরের প্রধান আকর্ষণ হল জওহরলাল নেহরু স্টেট মিউজিয়াম। এটি একটি অবশ্য দ্রষ্টব্য সংগ্রহশালা। এখানে অরুণাচলের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য উপজাতি গোষ্ঠীকে মডেলের সাহায্যে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলি খুব যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া উপজাতীয় মানুষদের দক্ষ হাতে তৈরি বেত এবং বাঁশের সামগ্রীর যে অসাধারণ সংগ্রহ এখানে রয়েছে তেমনটি আর অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিউজিয়ামের কাছেই এক টিলার মাথায় রয়েছে বুদ্ধ মন্দির।

ইটানগরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য হল বটানিক্যাল গার্ডেন, ক্র্যাফ্‌ট সেন্টার, ইন্দিরা গান্ধী পার্ক, মিনি জু এবং শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গঙ্গা লেক। গঙ্গা লেক যাবার পথেই পড়বে অর্কিড রিসার্চ সেন্টার। সংখ্যায় কম হলেও ইটানগরের পথে-ঘাটে নিশি উপজাতীয় মানুষদের দেখা মেলে। নিশি পুরুষদের মাথার ঝুঁটিতে সজারুর কাঁটা গোঁজা থাকে, নিশি মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলংকারের বৈচিত্র দেখেও অবাক হতে হয়।

হাপোলি এবং জিরো-কে যমজ শহর বললে ভুল হবে না। হাপোলি থেকে জিরো মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। যদিও জিরো হল লোয়ার সুবনসিরি জেলার সদর শহর, জিরোর তুলনায় হাপোলি বড় শহর। ইটানগর থেকে কিমিন চেকপোস্ট দিয়ে হাপোলি শহরে যেতে ১৬৭ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। বাস এবং শেয়ারের টাটা সুমো জাতীয় গাড়ি এই পথে চলাচল করে।

সম্প্রতি ইটানগর থেকে দুই মুখ হয়ে হাপোলি যাবার নতুন একটি পথ চালু হয়েছে। পথের অবস্থা কিছু কিছু জায়গায় খারাপ হলেও এই পথটি গেছে ঘন জঙ্গল ভেদ করে আদিম এলাকার ওপর দিয়ে। এই পথে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।

প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত হাপোলি এবং জিরো অঞ্চলটি হল আপাতানি উপজাতির বাসভূমি। অরুণাচলের ২৬টি প্রধান উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে আপাতানিরা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কৃষিকাজ, পশুপালন, বস্ত্রবয়ন এবং মাছ চাষে এরা অত্যন্ত দক্ষ। প্রাকৃতিক শক্তিকে এরা ভয়-ভক্তি করে। এদের উপাস্য হল সূর্য এবং চন্দ্র, যাঁরা দোয়নি-পোলো রূপে পূজিত।

আপাতানি মহিলাদের কপালে, চিবুকে উল্কি, গলাভর্তি রঙিন পাথরের মালা আর নাকে বেত বা কাঠের তৈরি নাকছাবি। আপাতানি ছাড়া লোয়ার সুবনসিরি জেলার অন্যান্য কয়েকটি উপজাতি হল দাফলা, হিলমিরি, সিম্পমি, বাংনি, মিজি, নিশি এবং সুলুং।

হাপোলি থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তারিন ফিশ ফার্ম ঘুরে আসা যায়, ভালো অভিজ্ঞতা হবে। হাপোলি থেকে মিনিবাসে চেপে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় জিরো শহরে। পাহাড়ে ঘেরা এক বিস্তৃত সমতল ভূখণ্ডে জিরো শহর গড়ে উঠেছে। শহরের কাছেই ছোট্ট বিমানঘাঁটি। একসময় ছোট বিমান ওঠা-নামা করত, এখন শুধু হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু আছে। জিরো শহরকে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট আপাতানি গ্রাম। যে কোনও গ্রামে গেলেই মিলবে আন্তরিক অভ্যর্থনা। উপজাতীয় সমাজের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে। জিরো থেকে ঘুরে আসা যায় তালে উপত্যকা এবং অভয়ারণ্য থেকে, দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার।

আপার সুবনসিরি জেলার সদর দাপোরিজো শহর, জিরো থেকে দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। দাপোরিজো যাবার পথটি বৈচিত্র এবং রোমাঞ্চে ভরা। চলার পথে আদিম অরুণাচলের অরণ্যক রূপ চোখে পড়বে। ভাগ্য ভালো হলে দেখা হয়ে যেতে পারে বিশালদেহী প্রাণী মিথুনের সঙ্গে। অনেকটা গাউর বা ভারতীয় বাইসনের মতো দেখতে এই প্রাণীটিকে অর্ধ-গৃহপালিত জীব বলা যায়। অরুণাচলের বেশকিছু উপজাতীয় মানুষদের মধ্যে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানে মিথুনের মাংস আত্মীয় এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা এক চিরাচরিত প্রথা।

মধ্য অরুণাচলের সুবনসিরি নদী উপত্যকায় একান্তে পড়ে থাকা ছোট্ট জনপদ দাপোরিজো। সুবনসিরি নদী উপত্যকার অনুপম শোভা চাক্ষুষ করতে হলে দাপোরিজো থেকে বাইরে যেতে হবে। দাপোরিজোর কাছে দূরের গ্রামগুলিতে প্রধানত তাগিন এবং হিলমিরি উপজাতীয় মানুষদের বাস। স্থানীয় একজন পথপ্রদর্শককে সঙ্গী করে পৌঁছে যেতে হবে কোনও উপজাতীয় গ্রামে। সেখানে গিয়ে মনে হবে এ এক অচেনা জগৎ। গ্রামবাসীদের সহজ-সরল জীবনযাত্রা দেখে এবং তাদের মিশুকে স্বভাবের পরিচয় পেয়ে এক অদ্ভুত ভালো লাগায় মন ভরে যাবে।

দাপোরিজো থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরবর্তী মেঙ্গাতে রয়েছে এক প্রাকৃতিক গুহা যার ভেতরে রয়েছে স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের বিচিত্র ভাস্কর্য। গাড়ি ভাড়া করে মেঙ্গা এবং আরও উত্তরে অবস্থিত তালিয়া এবং কোদক বেড়িয়ে আসা যায়।

দাপোরিজো থেকে পশ্চিম সিয়াং জেলার সদর শহর আলং-এর দূরত্ব ১৭৮ কিলোমিটার। যাওয়ার জন্য ভাড়ার গাড়ি বা

শেয়ারের সুমো জাতীয় গাড়ির ওপর নির্ভর করাই ভালো। অরুণাচলের পূর্ব এবং পশ্চিম সিয়াং জেলার প্রধান উপজাতীয় জনগোষ্ঠী হল আদি। শিক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতা এবং জীবনযাত্রার মানে আদিরা অন্যদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। সিয়াম নদীর ধারে অবস্থিত আলং শহরের উচ্চতা হাজার ফুটের কম বটে কিন্তু শহরের চেহারা-চরিত্রে বেশ একটা পাহাড়ি শহরের ভাব আছে।

আলং শহরের অন্যান্য দর্শনীয় স্থান হল জেলা সংগ্রহশালা, ক্র্যাফ্‌ট সেন্টার এবং দোয়নি পোলোর মন্দির। শহরের অদূরে সিয়াম ও সিয়াং নদীর সংগমস্থলটিও প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত।

আলং থেকে পাসিঘাটের দূরত্ব ১০৫ কিলোমিটার। এই পথের দুটি প্রধান আকর্ষণ হল কমলালেবুর বাগান এবং আদিম অরণ্য। ফলের মরশুমে ফলন্ত কমলালেবুর গাছ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

অরুণাচলের সবচেয়ে পুরনো শহর পাসিঘাট সিয়াং নদীর ধারে অবস্থিত। নদী পথেই আসামের ডিব্রুগড় শহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল পাসিঘাটের। এই যোগাযোগ আজও বজায় আছে। পাসিঘাটের প্রধান আকর্ষণ সিয়াং নদী। নদীর ফেরিঘাটে বসে থাকলে কীভাবে সময় কেটে যাবে, টের পাওয়া যাবে না।

পাসিঘাটের দ্রষ্টব্যগুলি হল ডাঙারিয়া শিবমন্দির, রানাঘাট ব্রিজ, দোয়নি পোলোর নবনির্মিত মন্দির, জেলা সংগ্রহশালা এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প।

পূর্ব অরুণাচল : প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে পূর্ব অরুণাচলে পর্যটকদের উপস্থিতি সবচেয়ে কম। এর প্রধান কারণটি হল পর্যটন শিল্পের অনুকূল পরিকাঠামোর অভাব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা। পূর্ব অরুণাচলের ভূগোলকে প্রভাবিত করেছে বেশ কয়েকটি বড় নদী। বর্ষাকালে এই সব নদীর জলে প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ এলাকা, সড়কপথ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। শীতকালে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও অকালবর্ষণের ফলে আবার সমস্যা দেখা দেয়।

সম্প্রতি ধওলাঘাট-সদিয়া সেতু নির্মিত হয়েছে অতি প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর। এর ফলে পূর্ব অরুণাচল ভ্রমণ এখন অনেকটাই সহজসাধ্য হয়েছে।

পাসিঘাট এবং আসামের তিনসুকিয়া, উভয় শহর থেকেই পূর্ব অরুণাচলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য শহর রোয়িং যাওয়া যায়। পাসিঘাটে সিয়াং নদী পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে পূর্ব অরুণাচলের মেবো শহরে। এখানে রোয়িং যাবার শেয়ারের সুমো জাতীয় গাড়ি পাওয়া যাবে। কোনও কারণে এই পথটি বন্ধ থাকলে পাসিঘাট থেকে ডিব্রুগড় হয়ে তিনসুকিয়া আসতে হবে। তিনসুকিয়া থেকে সরাসরি রোয়িং যাবার সরকারি বাস পাওয়া যাবে।

রোয়িং শহরটির অবস্থান পাহাড়ে ঘেরা একটি উপত্যকায়। ছোট্ট শহরটির সর্বাঙ্গে এক অদ্ভুত শান্তশ্রী জড়িয়ে আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা বয়ে চলেছে অত্যন্ত ধীর লয়ে। শহরের বাসিন্দারা বেশ মিশুকে এবং অতিথিবৎসল। রোয়িং শহরটি প্রায় সমতল হওয়ায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। রোয়িং মার্কেটে গিয়ে হাজির হলে চোখে পড়বে উপজাতীয় পুরুষ এবং মহিলারা কতরকম পসরা নিয়ে বসে আছে।

রোয়িং থেকে ৫ কিলোমিটার স্যালি লেক। জঙ্গলে ঘেরা স্যালি লেকের ধার দিয়ে পায়ে চলার পথ। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির কাকলিতে মুখরিত হয়ে থাকে প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন এই জায়গাটি।

রোয়িং থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মায়োডিয়া। এখানে রয়েছে বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত গভীর জঙ্গল।

রোয়িং থেকে তেজুর দূরত্ব ৮৮ কিলোমিটার। অরুণাচলপ্রদেশের ভূগোল এবং ইতিহাসে লোহিত জেলা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। লোহিত নদীর তীরবর্তী তেজু শহরটি বেশ পুরনো। লোহিত জেলা হল প্রধানত মিশমি, সিংফো আর খামতি উপজাতীয় মানুষদের বাসভূমি। তেজু শহর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে মিশমিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সিংফো এবং খামতিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং মিশমিরা প্রকৃতি উপাসক।

লোহিত জেলার সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গাটি হল পরশুরাম কুন্ড। হিন্দুদের কাছে পরশুরাম কুন্ড এক অতি পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বছর মকরসংক্রান্তির দিন দূরদূরান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ এসে উপস্থিত হন এই পবিত্র কুন্ডে স্নান করতে এবং তর্পণ করতে। এই উপলক্ষে এক মাস ধরে মেলা চলে।

বর্তমানে তেজু থেকে পরশুরাম কুন্ডে যাওয়া খুবই সহজ। তেজু থেকে গাড়ি ভাড়া করে অনায়াসেই পরশুরাম কুন্ড ঘুরে আসা যায়। তেজু শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য হল বোটানিক্যাল গার্ডেন, অরুণবিহার পার্ক, শিবমন্দির আর জেলা সংগ্রহশালা।

পূর্ব অরুণাচলের প্রায় শেষ প্রান্তে অবস্থিত বিখ্যাত জাতীয় উদ্যান এবং টাইগার রিজার্ভ নামদাফা যেতে হলে তেজু থেকে বাসে বা গাড়িতে প্রথমে আসামের তিনসুকিয়া শহরে যেতে হবে। তিনসুকিয়া শহর থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মিয়াও শহরে গিয়ে পৌঁছতে হবে। এখানেই রয়েছে নামদাফা ন্যাশনাল পার্কের সদর দপ্তর।

এক নজরে অরুণাচলের পর্যটন শিল্প : অরুণাচলপ্রদেশ এমনই এক রাজ্য যেখানে ভারী বা মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ সীমিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদও উল্লেখযোগ্য নয়। এছাড়া আরও কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে রাজ্যবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ কম। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে পর্যটন শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অরুণাচলে পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, একথা স্বীকার করতেই হবে। এই রাজ্যটিকে প্রকৃতিদেবী যেন নিজের হাতে সাজিয়েছেন, এমনই নয়নাভিরাম এখানকার প্রাকৃতিক শোভা। এই রাজ্যে রয়েছে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, আদিম অরণ্য, সুন্দর শৈলশহর, মনোমুগ্ধকর নদী উপত্যকা, ভীষ্মকনগর এবং মালিনীথানের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বিভিন্ন উপজাতীয় মানুষজনের বর্ণময় উপস্থিতি। এত কিছু সত্ত্বেও এক আদর্শ গন্তব্য রূপে অরুণাচলকে দেশ-বিদেশের পর্যটকমহলে উপস্থাপন করার বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। প্রচারের অভাবে ভ্রমণরসিকরা জানতেও পারছেন না মধ্য এবং পূর্ব অরুণাচলে ছড়িয়ে আছে এমন বেশ কিছু জায়গা যার তুলনা ভারতবর্ষে অন্য কোথাও নেই।

পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে রাজ্য সরকারের উদাসীনতার প্রমাণ মেলে বেশ কয়েকটি তথ্যের মাধ্যমে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে রাজ্যের বেশকিছু পর্যটন কেন্দ্রে রাত্রিবাসের জন্য কোনও সরকারি ট্যুরিস্ট লজ নেই। ইনারলাইন পারমিট পেতেও মাঝে মধ্যেই পর্যটকদের সমস্যায় পড়তে হয়। পর্যটন দপ্তরের মানসিকতা আরও প্রগতিশীল বা 'ডাইন্যামিক' করে তুলতে হবে, পর্যটন শিল্পের সার্বিক বিকাশের স্বার্থে। কারণ, অরুণাচলের মতো রাজ্যের ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমেই প্রচুর সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

মেঘালয়

১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি আসাম থেকে আলাদা হয়ে মেঘালয় রাজ্য আত্মপ্রকাশ।

মেঘালয়ের প্রধান তিনটি জনগোষ্ঠীর নাম খাসি, জয়ন্তিয়া আর গারো। মেঘালয়ের রাজধানী শহর শিলং হল খাসিদের খাসতালুক। ধর্মে খ্রিস্টান হলেও উপজাতীয় সংস্কার এবং মূল্যবোধের প্রতি খাসিরা শ্রদ্ধাশীল। খাসি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক অর্থাৎ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাই পরিবারের প্রধান। মেঘালয়ের উপজাতীয় মানুষজন, বিশেষ করে খাসিরা, অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল এবং সংগীতপ্রিয়।

মেঘালয়ের পর্যটন পরিকাঠামো প্রধানত খাসি পাহাড়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মেঘালয় রাজ্যটির তিনটি অংশ, খাসি পাহাড়, জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং গারো পাহাড়। সাম্প্রতিককালে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের জোয়াই অঞ্চলে পর্যটকদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা গারো পাহাড় আজও পর্যটকদের ভ্রমণসূচির বাইরে রয়ে গিয়েছে।

মেঘালয় ভ্রমণ শুরু হয় শিলং থেকে। শিলং যেতে হলে আগে গুয়াহাটি শহরে পৌঁছতে হবে। রেলপথে বা আকাশপথে গুয়াহাটি যাওয়া খুবই সহজ। গুয়াহাটি থেকে শিলংয়ের দূরত্ব ১০৩ কিলোমিটার। বাসে বা গাড়ি ভাড়া করে তিন ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

গুয়াহাটি থেকে ৮৭ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর পথের ডানদিকে চোখে পড়বে অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন উমিয়াম লেক যা বড়াপানি নামেও পরিচিত। বাঁধ দিয়ে নদীর প্রবাহকে রুদ্ধ করার ফলে বিচিত্র আকারবিশিষ্ট উমিয়াম লেকের সৃষ্টি হয়েছে। লেকের জলে ভেসে বেড়াবার জন্য বিভিন্ন ধরনের নৌকোর ব্যবস্থা আছে।

শিলং : ৪৮৬০ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন শিলং ছিল ব্রিটিশ শাসকদের প্রিয় শৈলশহর। তাঁরা শিলং-এর নাম দিয়েছিলেন 'স্কটল্যান্ড অব দি ইস্ট'। আজও শিলং শহরে ঘুরে বেড়াবার সময় চোখে পড়ে ব্রিটিশ আমলের সুন্দর সুন্দর চার্চ, বাংলো, ওয়ার্ডস লেক, গল্‌ফ কোর্স এবং আরও কতকিছু।

মেঘালয়ের রাজধানী শিলং বর্তমানে এক বিস্তৃত, ঘনবসতিপূর্ণ শহর। শহর থেকে বাইরে এলেই ঢেউ খেলানো সবুজ পাহাড়শ্রেণি আর খাসি পাইনের বন দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। শিলং-এর প্রাণকেন্দ্র হল পুলিশবাজার এলাকা। অসংখ্য হোটেল ছাড়াও এখানে রয়েছে রাজ্য পরিবহণ নিগমের বাস টার্মিনাস, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, মেঘালয় হেলিকপ্টার সার্ভিসের অফিস, মেঘালয় পর্যটন দপ্তরের কাউন্টার এবং কেনাকাটার জায়গা।

পাহাড়ি শহর হলেও চড়াই-উতরাই তেমন একটা না থাকায় শিলং শহরে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবার মজাই আলাদা। পুলিশবাজার এলাকায় থাকলে পায়ে হেঁটেই দেখে নেওয়া যায় বেশ কয়েকটি দ্রষ্টব্য যেমন, ওয়ার্ডস লেক, শিলং ক্লাব, বাটারফ্লাই মিউজিয়াম।

ওয়ার্ডস লেক এবং বটানিক্যাল গার্ডেন : শিলংবাসী এবং বহিরাগত পর্যটকদের প্রিয় জায়গা হল ফুলের বাগান এবং গাছপালায় ঘেরা এই কৃত্রিম লেক। লেকের ধার বরাবর রয়েছে বাঁধানো পথ। লেক পরিক্রমা করার সময় চোখে পড়বে রকমারি পাতাবাহার, ফুলগাছ, চেনা-অচেনা গাছপালা এবং শতাব্দী প্রাচীন পাইন গাছের জটলা। লেকের প্রায় মাঝখানে একটি কাঠের সেতু দুই প্রান্তকে যুক্ত করেছে। সেতুর ওপর থেকে রং-বেরঙের মাছ দেখতে বেশ লাগে।

ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল : দৃষ্টিনন্দন এই ক্যাথিড্রালটি ভারতের বৃহত্তম চার্চগুলির অন্যতম। যিশুর জীবনের নানান ঘটনা নিয়ে দক্ষ শিল্পীর আঁকা অসংখ্য ছবি এই গির্জার অন্যতম আকর্ষণ।

লেডি হায়দারি পার্ক : ফুল দেখতে হলে লেডি হায়দারি পার্কে একবার আসতেই হবে। শীতের মরশুমে ফুলের রংবাহার দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। পার্কের ভেতরেই রয়েছে ছোট্ট একটি চিড়িয়াখানা।

এলিফ্যান্ট ফল্‌স : মেঘালয়ের সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাত রূপে স্বীকৃত এলিফ্যান্ট ফলস দেখার সেরা সময় জুলাই এবং আগস্ট মাসে। দুটি ধাপে ওপর থেকে নেমে আসা জলপ্রপাতের ধার দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে অনেকটা নীচে যেখানে জল পড়ে পড়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি জলকুণ্ডের।

শিলং পিক : এলিফ্যান্ট ফল্‌স থেকে শিলং পিক বেশি দূরে নয়। ১৯৬৫ মিটার উঁচু শিলং পিক থেকে শিলং শহর এবং শহরকে ঘিরে থাকা পাহাড়-জঙ্গলের শোভা মনোমুগ্ধকর।

শিলং গল্‌ফ কোর্স : শিলং গল্‌ফ কোর্স ভারতের সবচেয়ে পুরনো এবং বিখ্যাত গল্‌ফ কোর্সগুলির অন্যতম। মখমল সদৃশ সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢেউ খেলানো প্রান্তরের মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে পাইনের বন। প্রাকৃতিক শোভার বিচারে শিলং গল্‌ফ কোর্সের তুলনা মেলা কঠিন।

ইস্টার্ন এয়ার কমান্ড মিউজিয়াম : ভারতীয় বিমানবাহিনীর গৌরবময় ইতিহাসকে জানতে হলে আপার শিলং এলাকায় অবস্থিত এই মিউজিয়ামে আসতেই হবে। সব মিলিয়ে এটি এক অসাধারণ সংগ্রহশালা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা জানা যাবে অসংখ্য আলোকচিত্র, মানচিত্র এবং পরিবেশিত তথ্যের মাধ্যমে। এই মিউজিয়ামে এতকিছু দেখার আছে যে, হাতে একটু সময় নিয়ে এলে ভালো হয়।

ওয়াংখার বাটারফ্লাই মিউজিয়াম : শিলং বেড়াতে গিয়ে সময় করে প্রজাপতি এবং কীটপতঙ্গের এই অভিনব সংগ্রহশালাটি অবশ্যই দেখে নেওয়া উচিত। পুলিশবাজারের অদূরবর্তী ওয়াহিংদো এলাকায় অবস্থিত এই পারিবারিক মিউজিয়ামটি ১৯৭৩ সালে

স্থাপিত হয়েছিল এস কে সরকার নামে একজন বাঙালি প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপকের উদ্যোগে। উত্তর-পূর্ব ভারত এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত প্রজাপতি, মথ, মাকড়সা, পাতাপোকা, কাঠিপোকা ফড়িং, কেন্নো, তেতুলবিছে এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের বৈচিত্রে ভরা সংগ্রহ দেখে তাক লেগে যায়।

স্টেট মিউজিয়াম : প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক সামগ্রী ছাড়াও এই সংগ্রহশালায় রাজ্যের বিভিন্ন আদিবাসী এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠীদের নিয়ে রয়েছে আকর্ষণীয় গ্যালারি। স্টেট মিউজিয়ামের অন্যতম আকর্ষণ হল হস্তশিল্প সামগ্রীর মূল্যবান সংগ্রহ।

শিলং শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে শ্রীঅরবিন্দ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ান কালচার, বিশপ বিডন ফল্‌স, স্প্রেড ঈগল ফল্‌স এবং স্যুইট ফল্‌স।

শিলং থেকে কিছুটা দূরবর্তী কয়েকটি দর্শনীয় স্থান হল চেরাপুঞ্জি, মওসিনরাম, মাওলিনং এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিত নারটিয়াং। এই জায়গাগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য নীচে পরিবেশিত হল।

চেরাপুঞ্জি : শিলং থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরবর্তী চেরাপুঞ্জি (উচ্চতা ৪২৬৭ ফুট) যাওয়ার পথেই মেঘালয়ের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং খাসি পাহাড়ের নয়নাভিরাম শোভা চাক্ষুষ করার সুযোগ হবে। অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণির ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়বে ছোট ছোট গ্রাম, খণ্ড খণ্ড কৃষিজমি আর ফলের বাগান। এছাড়া দেখা যাবে খোলামুখ কয়লার খনি আর পাথরের খাদান।

চেরাপুঞ্জি বেশ পুরনো জনপদ এবং ব্রিটিশ আমলে খাসি পাহাড়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল চেরাপুঞ্জি বা সোহরা। এখনও পুরনো গির্জা, সমাধিক্ষেত্র এবং ঘরবাড়ি এই জায়গাটির গৌরবময় অতীতের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চেরাপুঞ্জির অন্যান্য দর্শনীয় স্থান হল নোহকালিকাই ফল্‌স, ইকোপার্ক, বাংলাদেশ ভিউ পয়েন্ট, সেভেন সিস্টার ফল্‌স, নংগিথিয়াং ফল্‌স এবং মওসমাই কেভ। এক সময় চেরাপুঞ্জিকে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের স্থান বলে অভিহিত করা হত। বর্তমানে এই শিরোপাটি উঠেছে মওসিনরামের মাথায়।

মওসিনরাম : শিলং থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরবর্তী মওসিনরাম জায়গাটির অবস্থান চেরাপুঞ্জির পশ্চিমে। মওসিনরামের বৃষ্টিভেজা রূপ দেখতে হলে ভরা বর্ষায় এখানে আসতে হবে। এখানে বেড়াতে এসে যেসব দর্শনীয় স্থান দেখার সুযোগ হয়, তাদের মধ্যে দুটি নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এদের মধ্যে একটি হল ক্রেমমাওজুমবুঁই এবং অপরটির নাম জাকরেম। প্রথমটি একটি প্রাকৃতিক গুহার নাম। একজন পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে এই গুহার ভেতরে প্রবেশ করা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। জাকরেম জায়গাটি উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, প্রস্রবণের জলে স্নান করলে নানারকম চর্মরোগ সেরে যায়।

মওসিনরামের অন্য দুটি দ্রষ্টব্য হল খ্রেং খ্রেং রক এবং রিতমাংসির ভিউ পয়েন্ট।

মাওলিনং : মেঘালয়ের একটি ছোট্ট গ্রামের নাম মাওলিনং। শিলং থেকে দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। গ্রামবাসীদের মিলিত প্রচেষ্টায় রাজ্যের এক কোণে পড়ে থাকা মাওলিনং মেঘালয়ের পর্যটন মানচিত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মানুষজন পরিচ্ছন্ন থাকার মানসিকতা এবং অভ্যাসকে এমন একটি উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন যে, এখানে এসে মনেই হয় না মাওলিনং ভারতের কোনও গণ্ডগ্রাম।

গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এবং গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বেতের তৈরি ডাস্টবিন রাখা আছে। ময়লা জমলেই তার স্থান হয় এই সব ডাস্টবিনে। মাওলিনং গ্রামে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে ছোট-বড় ফুলের বাগান। যাদের জমির অভাব, তারা বারান্দায় টব ঝুলিয়ে ফুল ফোটাচ্ছেন। এই সব কারণেই মাওলিনং 'এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম' শিরোপাটির অন্যতম দাবিদার।

সব মিলিয়ে মাওলিনং এমনই এক শান্তশ্রীসম্পন্ন গ্রাম, যেখানে কোলাহলবর্জিত, দূষণহীন পরিবেশে দু-একটা দিন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেওয়া যায়। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে থাইলং নদী। নদী পারাপার করার জন্য স্থানীয় অধিবাসীরা তৈরি করেছেন অভিনব 'লিভিং রুট ব্রিজ'। নদীর দুই তীরে অবস্থিত এক বিশেষ প্রজাতির গাছের শিকড়গুচ্ছকে যুক্ত করে তৈরি করা এই সেতুবন্ধন দেখে সত্যিই তাক লেগে যাবে।

নারটিয়াং : এক সময় জয়ন্তিয়া রাজাদের রাজধানী ছিল নারটিয়াং। শিলং থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরবর্তী নারটিয়াং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিত। নারটিয়াং এবং সংলগ্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে জয়ন্তিয়া রাজত্বের নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য হল সংরক্ষিত বড় আকারের প্রস্তরখণ্ড, যেগুলিকে স্মৃতিস্তম্ভ বলা চলে। ইংরেজিতে বলা হয় মনোলিথ। নারটিয়াংয়ের সবচেয়ে বিশালাকার মনোলিথটির উচ্চতা ২৭ ফুট।

নারটিয়াংয়ের অদূরেই রয়েছে প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত থাডলাসকেন লেক। এটি একটি কৃত্রিম সরোবর যা জয়ন্তিয়া রাজাদের আমলে খনন করা হয়েছিল।

নারটিয়াংয়ের দুর্গামন্দিরের স্থাপত্যের মধ্যেও বেশ বৈচিত্র আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, এককালে দুর্গাপুজোর সময় মন্দিরে নরবলি দেওয়া হত। দুর্গামন্দির ছাড়া এখানকার প্রাচীন শিবমন্দিরটিও বেশ বিখ্যাত।

নারটিয়াং থেকে ঘুরে আসা যায় জেলা সদর জোয়াই শহর থেকে। জোয়াই শহরের কাজেপিঠের কয়েকটি দ্রষ্টব্য হল লালং পার্ক এবং থিরসি ঝরনা।

এক নজরে মেঘালয়ের পর্যটন শিল্প : গত দু-দশক ধরে মেঘালয় পর্যটন দপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের উন্নতি করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এর সুফলও এখন পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য পর্যটন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলং ট্যুর, চেরাপুঞ্জি ট্যুর, মওসিনরাম ট্যুর, মাওলিনং ট্যুর এবং নারটিয়াং ট্যুর। এই সব ট্যুর পর্যটকমহলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সারা বছর ধরেই দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এখন মেঘালয়ে এসে হাজির হচ্ছেন এবং ভ্রমণ শেষে একরাশ মধুর স্মৃতি নিয়ে ঘরে

ফিরছেন। বর্ষাকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য শৈলশহরে যখন পর্যটকদের উপস্থিতি নামমাত্র তখন ভ্রমণরসিকরা মেঘালয়ে এসে হাজির হন এখানকার জলপ্রপাতগুলির জল থইথই রূপ দেখতে। চেরাপুঞ্জি-মওসিনরামের মতো জায়গাগুলি দেখার সেরা সময় হল বর্ষকাল।

মেঘালয়ের মতো ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্যের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্পের আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার অবকাশ আছে। রাজ্যের প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন, স্বল্পপরিচিত জায়গাগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে এই সব জায়গার সঙ্গে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য রাজ্য পর্যটন দপ্তরকে আরও তৎপর হতে হবে। মেঘালয়ে 'ভিলেজ ট্যুরিজম' ধারণাটিকে বাস্তবায়িত করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী যুবক-যুবতীরাও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবেন।

মেঘালয়ের অধিবাসীরা নৃত্য এবং সংগীত প্রিয়। রাজ্যের ছোট-বড় শহরগুলিতে বছরভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই বিষয়টিকেও সুপরিকল্পিতভাবে পর্যটকদের আকর্ষণ করার কাজে লাগানো যেতে পারে।

নাগাল্যান্ড

নাগাল্যান্ডের মতো বৈচিত্রে ভরা রাজ্য ভারতে আর দ্বিতীয়টি আছে কি না সন্দেহ আছে। নাগাল্যান্ডের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, শিরোভূষণ, লোকনৃত্য, সংগীত, সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক উৎসব, সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে এক প্রবল নিজস্বতা। ব্রিটিশ শাসকদের এই নাগাপাহাড়ে এসেই স্বাধীনচেতা এবং রণকুশল নাগাদের পরাক্রমে পদে পদে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, নাগাল্যান্ডে আজও দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা নগণ্য। অনেকের ধারণা রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যটনের পক্ষে অনুকূল নয়। এমন ধারণার যাতে পরিবর্তন ঘটে তার জন্য রাজ্য সরকারের তেমন কোনও উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বহিরাগত পর্যটকদের পক্ষে কোহিমা ছাড়া নাগাল্যান্ডের অন্যান্য এলাকায় নিজেদের উদ্যোগে ঘুরে বেড়ানো বেশ কঠিন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নাগাল্যান্ডে অবাধে এবং নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে হলে প্রয়োজন একজন নাগা সঙ্গীর যে একই সঙ্গে গাইড এবং দোভাষীর দায়িত্ব পালন করবে। এই ব্যাপারে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার অবকাশ আছে।

নাগাল্যান্ড পর্যটন দপ্তর বুদ্ধি করে প্রায় সমগ্র নাগাল্যান্ডকেই এনে হাজির করেছেন কোহিমার হর্নবিল উৎসবে। উৎসবের সঙ্গে 'হর্নবিল' শব্দটি যুক্ত করার কারণটি হল নাগাল্যান্ডের সমস্ত উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কাছে হর্নবিল বা ধনেশ পাখি হল সৌন্দর্য, নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, বীরত্ব এবং সততার প্রতীক।

দেড় দশক আগে কোহিমা শহরে হর্নবিল উৎসবের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীকালে উৎসব স্থান স্থানান্তরিত হয় কোহিমা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কিসামা গ্রামের নাগা হেরিটেজ কমপ্লেক্স-এ। প্রতি বছর ১ থেকে ৭ ডিসেম্বর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি করা নাগা হেরিটেজ কমপ্লেক্স-এ রাজ্যের ১৬টি প্রধান উপজাতি তাদের বাসস্থান, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, খাবার-দাবার এবং সংস্কৃতিকে দর্শকদের সামনে সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

হর্নবিল উৎসবের বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠান হল বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর নৃত্য এবং সংগীত, নাগাদের নিজস্ব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে নকল যুদ্ধ, কৌতুক নকশার মাধ্যমে নাগা সমাজের কোনও সমস্যাকে তুলে ধরা, ফ্যাশন শো, বিউটি কনটেস্ট এবং সন্ধের পর বিভিন্ন নাগা ব্যান্ডের দ্বারা পাশ্চাত্য সংগীত পরিবেশনা।

উৎসব প্রাঙ্গণে সরকারি এবং বেসরকারি ফুড স্টলে পরিবেশিত হয় রকমারি নাগা পদ। অন্যান্য স্টলে বিক্রি হয় নাগা হস্তশিল্প সামগ্রী এবং অলংকার।

হর্নবিল উৎসবের সময় এবং তার পরেও নাগাল্যান্ড পর্যটন দপ্তর কয়েকটি বিশেষ প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করে। এই সব প্যাকেজ ট্যুরে অংশ নিয়ে কোহিমা থেকে দূরবর্তী দর্শনীয় স্থানগুলি বেড়িয়ে আসা যায়। এছাড়া পর্যটন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় ট্রেকিং করে পৌঁছে যাওয়া যাবে অপার প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত সবুজ উপত্যকায় আর পাহাড়ি এলাকায়।

প্রায় ৪৭০০ ফুট উঁচু কোহিমা এক সুন্দর পাহাড়ি শহর। একাধিক শহরের ওপর ছড়িয়ে আছে এই শহর। শহরের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যগুলি হল ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল, কোহিমা ভিলেজ, কোহিমা ওয়ার সেমেটেরি, স্টেট মিউজিয়াম, নাগা সেল্‌স এম্পোরিয়াম এবং কোহিমা মার্কেট।

কোহিমায় যেতে হলে ট্রেনে, বাসে বা আকাশ পথে ডিমাপুর পৌঁছতে হবে। দিমাপুর থেকে ৭৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কোহিমা।

শুধুমাত্র হর্নবিল উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে আবর্তিত। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকার এবং পর্যটন দপ্তর চিন্তাভাবনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে তবেই নাগাল্যান্ডে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে গতি আসবে।

মণিপুর

নাগাল্যান্ডের কোহিমা থেকে মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল শহরের দূরত্ব মাত্র ১৪৩ কিলোমিটার। সড়কপথে এই স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করতেই অনেক সময় স্থানীয় মানুষজন এবং পর্যটকরা সমস্যায় পড়েন। এর কারণটি হল নানান ধরনের আন্দোলনের ফলে যখন-তখন এই পথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, তাই আকাশপথে ইম্ফল যাওয়াই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়।

মণিপুর রাজ্যের প্রায় মাঝ বরাবর রয়েছে বিস্তৃত ইম্ফল উপত্যকা আর এই উপত্যকার কেন্দ্রে ইম্ফল শহরের অবস্থান। উপত্যকার সমতলভূমির চারদিকেই রয়েছে পাহাড়ের প্রাচীর। এই পার্বত্যভূমিতে বাস করে বিভিন্ন উপজাতির মানুষ, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হল কাবুই, আঙ্গামী, মার, লুসাই, কুকি, রালতে, সেমা এবং তাংখুল

নাগা। এই সব পাহাড়ি অধিবাসীদের বেশির-ভাগই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। উপত্যকার অধিবাসীরা প্রায় সবাই হিন্দু এবং বৈষ্ণব। এরা মৈতেই নামে পরিচিত।

মণিপুরে পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো কত কিছুই না আছে। মণিপুরে দ্রষ্টব্যের মধ্যে রয়েছে লোকটাক লেক যার তুলনা অন্য কোথাও নেই, আছে বিরল সাঙ্গাই হরিণের বাসভূমি কেইবল লামজাও ন্যাশনাল পার্ক, ঐতিহাসিক জনপদ মৈরাং, ইম্ফলের শ্রীগোবিন্দজির মন্দির, মহিলা পরিচালিত বৈচিত্রেভরা ইম্ফলের ইমা মার্কেট, অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন শৈলশহর উখরুল এবং আরও বেশকিছু দ্রষ্টব্য।

মণিপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। মৈতেই সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল নৃত্য এবং সংগীত। মণিপুরি নৃত্যশৈলী তার উচ্চতম শিখরে পৌঁছেছে 'রাসলীলা' নৃত্যে। দেশ-বিদেশের দর্শককে এই মণিপুরি নৃত্যকলার অনুষ্ঠান মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। মণিপুরের আরেকটি বড় উৎসবের নাম 'লাই-হারোবা'। প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে মৈরাং এবং রাজ্যের অন্যান্য স্থানে নৃত্য এবং সংগীতের মাধ্যমে পালিত হয় এই উৎসব।

নাগাল্যান্ডে যেমন হর্নবিল উৎসবকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের পর্যটক সমাগম ঘটে ঠিক তেমনই মণিপুরের ইম্ফল শহরের রথযাত্রা এবং দোল উৎসব উপলক্ষে প্রচুর মানুষ এসে উপস্থিত হন।

সব মিলিয়ে মণিপুর এমনই এক রাজ্য যেখানে বেড়াতে এসে পর্যটকরা স্বীকার করবেন যে এমন জায়গায় আগেই আসা উচিত ছিল।

মিজোরাম

মিজোরাম সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল এখন মিজোরাম ভারতের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ রাজ্যগুলির অন্যতম। একসময় এই পাহাড়ি রাজ্যটি উগ্রপন্থী কার্যকলাপের পীঠস্থান ছিল।

আসামের শিলচর শহরকে বলা হয় মিজোরামের প্রবেশদ্বার। শিলচর থেকে সড়কপথে মিজোরামের রাজধানী আইজল শহরের দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। আকাশপথেও কলকাতা, গুয়াহাটি এবং আরও বেশ কয়েকটি শহর আইজলের সঙ্গে যুক্ত।

মিজোরাম যেতে হলে ভারতীয় নাগরিকদের ইনার-লাইন পারমিট সংগ্রহ করতে হয়।

আয়তনের দিক দিয়ে ভারতের বৃহত্তম পাহাড়ি শহরগুলির অন্যতম আইজলের উচ্চতা ৩৭১৫ ফুট। আইজল হল লুসাই পাহাড়ের হৃৎপিণ্ড। ভারি বিচিত্র এই শহর। ভোরের আলো ফোটার আগেই আইজল শহর জেগে ওঠে। দেখতে দেখতে কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে শহরের অধিবাসীরা। ভরদুপুরে আইজল শহরের ছবি অন্য যে কোনও শৈলশহরের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাবে, কিন্তু সূর্যাস্তের এক-দেড় ঘণ্টা পরেই পুরো শহরটাই যেন ঘুমিয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট ফাঁকা, দোকানপাট বন্ধ, সব মিলিয়ে বহিরাগত পর্যটকদের কাছে এক অদ্ভুত পরিবেশ। তবে এই নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, মিজোরামে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই।

আইজল শহরে ঘুরে বেড়াবার জন্য সিটি বাস সার্ভিস বেশ সুবিধাজনক। তবে এই শহরে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোও এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। সুযোগ পেলে অবশ্যই একবার আইজল মার্কেট যাওয়া উচিত। উপজাতীয় মহিলাদের বসন-ভূষণ আর তাদের পশরা দেখে অবাক হতে হবে।

আইজল শহরে দর্শনীয় স্থানের সংখ্যা মাত্র কয়েকটি হলেও বাস্তব ঘটনা হল পুরো শহরটাই দর্শনীয়।

ভোরবেলায় ডার্টলং পাহাড়ে গিয়ে হাজির হলে চোখে পড়বে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। দূরের নীল পাহাড়ের কোলে সাদা মেঘেরা আশ্রয় নিয়েছে। মেঘের সমুদ্রে শুধু পাহাড়ের মাথাগুলো ভেসে আছে। একটু বেলা হলেই মেঘেরা পাহাড় ছেড়ে আকাশে উঠে পড়বে। এই ডার্টলং পাহাড়েই আছে ছোট্ট এক চিড়িয়াখানা যেখানে রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিরল প্রাণীর দর্শন পাওয়া যাবে। আইজলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল থিওলোজিকাল কলেজ, কেভি প্যারাডাইস, গসপেল চার্চ, স্টেট মিউজিয়াম এবং লুয়াংমুয়াল হস্তশিল্প কেন্দ্র।

সংগীত এবং নৃত্য মিজোদের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তা অনুভব করতে হলে এদের কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে।

মিজোদের সবচেয়ে বড় উৎসব চাপচারকুট হল বসন্তের উৎসব। সাতদিন ধরে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় মার্চ মাসের প্রথম দিকে। অন্য দুটি উল্লেখযোগ্য উৎসবের নাম মিমকুট (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) এবং পলকুট (ডিসেম্বর)। এছাড়া খ্রিস্টান প্রধান মিজোরামে বড়দিন এবং নববৎসর উৎসবও পালিত হয় প্রবল উৎসাহসহকারে।

মিজোরামের অনুপম নিসর্গ চাক্ষুষ করতে হলে আইজল থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত কয়েকটি জায়গায় যেতে হবে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে চাম্ফাই শহরের নাম। আইজলের দক্ষিণ-পূর্বে, মায়ানমার সীমান্তবর্তী এই মহকুমা শহর থেকে উপত্যকা এবং পাহাড়ের শোভা নয়নাভিরাম। আইজল থেকে চাম্ফাইয়ের দূরত্ব ২০৪ কিলোমিটার।

আইজল থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে ২৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত লুংলেই-এর প্রাকৃতিক শোভা অনবদ্য।

উত্তর-পূর্ব ভারতের এক কোণে অবস্থিত মিজোরামের পর্যটন শিল্পের অবস্থা অনেক রাজ্যের তুলনায় ভালো। সমস্যা হল মিজোরামের পর্যটন কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পর্যটকদের স্পষ্ট ধারণা নেই, তাই খুব অল্প সংখ্যক মানুষ মিজোরামে বেড়াতে আসেন। এর জন্য দায়ী প্রচারের অভাব। এই বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিলে রাজ্যের পর্যটন শিল্প যে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে, এই নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।❑

[লেখক পাঠকমহলে রবীন চক্রবর্তী নামেই সুপরিচিত। গত ১৪ বছর ধরে 'ভ্রমণ' পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। দীর্ঘদিন পর্যটন নিয়ে লেখালিখির জন্য ২০১৩ সালে তিনি 'কলম সম্মান'-এ ভূষিত হন।]

সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল : আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন

উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা তথা ভূমি ও বনজ সম্পদের ওপর এই ভূমিপুত্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকেই ভারতের সংবিধানে ষষ্ঠ তপশিলের অবতারণা। ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী গঠিত মেঘালয়ের স্বশাসিত জেলা পরিষদগুলির কাজকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন—**ড. চিন্তামণি রাউত।**

অখণ্ড খাসি-জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা এবং গারো পার্বত্য জেলা নিয়ে ১৯৭০ সালের ২ এপ্রিল গঠিত হয় স্বশাসিত রাজ্য মেঘালয়। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি এটি একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি পায়। স্থানীয় স্বশাসন গণতন্ত্রের ভিত্তি। খাসি উপজাতির দীর্ঘদিনের একটা স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা তাদের সমাজজীবনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতেও এই প্রতিষ্ঠান সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে স্বশাসনের 'প্রথাগত প্রতিষ্ঠান'-ও বলা যেতে পারে। এখনও এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। খাসি পার্বত্য অঞ্চলে স্বশাসনের ধারণাটা প্রায় কয়েক শতাব্দী প্রাচীন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে এসেছে এবং নিজেদের ইচ্ছার কথা জানিয়েছে; তারপর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার বিশেষ তাগিদ অনুভব করেন সংবিধান রচয়িতারা। ভূমি ও বনজসম্পদের ওপর এই উপজাতি সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন তাঁরা। এর ফলে সংবিধানে যোগ হয় ষষ্ঠ তপশিল যেখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের বিধান দেওয়া হয়।

সেইমতো, ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল অনুযায়ী অখণ্ড খাসি ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলায় গঠিত হয় খাসি-জয়ন্তিয়া স্বশাসিত জেলা পরিষদ। পরে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদকে দুভাগ করে দুটি পৃথক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়, যথা খাসি পর্বত স্বশাসিত জেলা পরিষদ (KHADC) এবং জয়ন্তিয়া পর্বত স্বশাসিত জেলা পরিষদ (JHADC)। পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলা, পশ্চিম খাসি পার্বত্য জেলা ও রিভই জেলা জুড়ে KHADC-এর এক্তিয়ার। অন্যদিকে, মেঘালয়ের গারো অঞ্চল রয়েছে গারো পর্বত জেলা পরিষদের এক্তিয়ারে।

ষষ্ঠ তপশিলের ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী (সংবিধানের ২৪৪ ও ২৭৫নং ধারা) রাজ্যপাল বিজ্ঞপ্তি জারি করে কোনও নতুন স্বশাসিত জেলা গঠন করতে পারেন; অথবা স্বশাসিত জেলা থেকে কোনও এলাকাকে বাদ দিতে পারেন; দুই বা ততোধিক স্বশাসিত জেলা বা সেগুলির অংশকে সংযুক্ত করে একটি নতুন স্বশাসিত জেলা গঠন করতে পারেন; যেকোনও স্বশাসিত জেলার সীমানা নির্ধারণ করতে পারেন এবং কোনও স্বশাসিত জেলার নামকরণের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিশনের সুপারিশ এবং কমিশনের প্রদত্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে রাজ্যপাল যে কোনও স্বশাসিত জেলার নাম পরিবর্তনও করতে পারেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদগুলির প্রশাসনিক এলাকার পরিবর্তন, পরিমার্জন বা বিলোপের ক্ষেত্রে রাজ্যপালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী।

জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের গঠন

প্রতিটি স্বশাসিত জেলায় অনধিক তিরিশ সদস্যকে নিয়ে একটি জেলা পরিষদ গঠিত হবে। এদের মধ্যে অনধিক চারজন সদস্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং বাকিরা প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। এই তপশিল অনুযায়ী গঠিত প্রতিটি স্বশাসিত অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র আঞ্চলিক পরিষদ থাকবে। সংশ্লিষ্ট জেলা ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নামানুসারে ওই জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদের নাম হবে। এই জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদের স্থায়ী অস্তিত্ব থাকবে ও এই পরিষদগুলির নির্দিষ্ট নামে সিলমোহরও থাকবে এবং যেকোনও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে পরিষদের ওই নামই ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্বশাসিত জেলা ও অঞ্চলের চালু উপজাতি পরিষদ বা প্রতিনিধি স্থানীয় অন্যান্য উপজাতি সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জেলা পরিষদগুলির প্রথম সংবিধানের বিধি-নিয়ম স্থির করে দেন রাজ্যপাল। এই বিধি-নিয়ম অনুযায়ী জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলির গঠন, আসন বণ্টন, জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদগুলিতে কাজকর্ম পরিচালনার পদ্ধতি, তথা এই পরিষদগুলিতে কর্মী ও আধিকারিক নিয়োগের বিষয়টি নির্ধারিত হয়। কোনও কারণবশত জেলা পরিষদকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ভেঙে দেওয়া না হলে এই পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম বৈঠকের নির্ধারিত দিন থেকে শুরু করে পরবর্তী পাঁচ বছর। পরিষদের মনোনীত সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ রাজ্যপালের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলির ক্ষমতা

কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত এলাকায় সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদ এবং কোনও স্বশাসিত জেলায় এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের হাতে জমি বরাদ্দ, জমির ভোগ দখল, ব্যবহার বা কৃষি বা পশুচারণ বা বসতি স্থাপন কিংবা কোনও গ্রাম অথবা শহরের বাসিন্দাদের স্বার্থে অকৃষিমূলক বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যতীত অন্য কোনও জমি পৃথক করে রাখার ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। এছাড়াও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অরণ্যভূমির পরিচালনা, কৃষিকাজে কোনও খাল বা জলাশয়ের ব্যবহার, ঝুম বা অন্যান্য স্থানান্তর কৃষি পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ, গ্রাম ও নগর কমিটি গঠন ও সেগুলির ক্ষমতা নির্ধারণ, শহর ও গ্রামের পুলিশ-প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ বা তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন, সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি-সহ শহর ও গ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিতেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে এই পরিষদগুলির হাতে।

স্বশাসিত জেলা ও স্বশাসিত অঞ্চলে বিচার ব্যবস্থা

কোনও স্বশাসিত অঞ্চলের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত এলাকায় সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদ এবং স্বশাসিত অঞ্চলের কোনও এলাকা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদের এক্তিয়ারের বাইরে থাকলে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রাম পরিষদ অথবা আদালত গঠন করতে পারে। রাজ্যের সমস্ত আদালতের এক্তিয়ার ছাড়িয়ে যেসমস্ত মামলার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তপশিলের ধারাগুলি প্রযোজ্য তার বাইরেও এই সমস্ত এলাকার কোনও মামলা-মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষই তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলে এই গ্রাম পরিষদ বা বিশেষ আদালত গঠন করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বা জেলা পরিষদ এই গ্রাম পরিষদগুলিতে যোগ্য ব্যক্তিদের এবং আদালতগুলিতে পরিচালক বা প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবে এবং সেইসঙ্গে ষষ্ঠ তপশিলের আওতায় প্রণীত আইনগুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন মতো উপযুক্ত আধিকারিকদেরও নিয়োগ করতে পারবে। ষষ্ঠ তপশিলের বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমার ওপর হাইকোর্ট তদারকি করতে পারবে। হাইকোর্টের এই ক্ষমতা রাজ্যপাল বিভিন্ন সময়ে আদেশ জারি করে স্থির করে দেবেন।

ক্ষেত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদ বা জেলা পরিষদ রাজ্যপালের পূর্ব সম্মতিক্রমে গ্রাম পরিষদ ও আদালতগুলির গঠন ও সেগুলির ক্ষমতা, মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বা আপিল এবং অন্যান্য কাজকর্মের ক্ষেত্রে গ্রাম পরিষদ বা আদালতগুলির অনুসৃত পদ্ধতি, গ্রাম পরিষদ এবং আদালতের সিদ্ধান্ত বা আদেশের প্রয়োগ তথা ষষ্ঠ তপশিলের আওতাভুক্ত আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি রূপায়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মবিধি প্রণয়ন করতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপনে জেলা পরিষদের ক্ষমতা

কোনও স্বশাসিত জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, বাজার, ফেরি, মৎস্যচাষের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা, সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা এবং জলপথ স্থাপন, নির্মাণ অথবা পরিচালনা করতে পারে এবং সেইসঙ্গে রাজ্যপালের পূর্বসম্মতিক্রমে এই বিষয়গুলির ওপর বিভিন্ন বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করতে পারে, বিশেষত, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভাষা স্থির করতে পারে। জেলা পরিষদের সম্মতিক্রমে রাজ্যপাল শর্তসাপেক্ষে অথবা নিঃশর্তভাবে পরিষদ বা পরিষদের কোনও আধিকারিকের ওপর কৃষি, পশুপালন, জনসমষ্টির জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প, সমবায় সমিতি, সমাজ কল্যাণ, গ্রামীণ পরিকল্পনা-সহ রাজ্যের শাসন ক্ষমতার এক্তিয়ারভুক্ত যে কোনও দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন।

জেলা ও আঞ্চলিক তহবিল

প্রতিটি স্বশাসিত জেলা পরিষদকে প্রত্যেক স্বশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি করে জেলা তহবিল গঠন করতে হয়। সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষ ওই ধরনের জেলা বা অঞ্চলের প্রশাসন কার্য পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পরিষদ বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদ মোট যে অর্থ পাবে তা এই আঞ্চলিক তহবিলে জমা হবে। জেলা তহবিল বা আঞ্চলিক তহবিলের পরিচালনা এবং উক্ত তহবিলগুলিতে টাকা জমা দেওয়া বা সেখান থেকে টাকা তোলার নিয়ম, তহবিলে গচ্ছিত অর্থের হেফাজত ও এই বিষয়গুলির সঙ্গে জড়িত আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে বিধি-নিয়ম প্রণয়ন করতে পারেন রাজ্যপাল। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই জেলা পরিষদের হিসাবের খাতার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল যেভাবে প্রয়োজন মনে করবেন ঠিক সেভাবেই জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের হিসাবের খাতার পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের এই পরীক্ষা বা অডিটের প্রতিবেদন রাজ্যপালের কাছে জমা দিতে হবে এবং রাজ্যপাল আবার এই প্রতিবেদন পরিষদের কাছে পাঠাবেন।

পরিশেষে

জেলা পরিষদগুলি এই অঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে। মেঘালয়ে জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদগুলি অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তবে পরিষদগুলিকে কর্মসংস্কৃতির আরও উন্নতি ঘটাতে হবে। সেইসঙ্গে পরিষদে আরও দক্ষ সুশিক্ষিত প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করতে হবে যাঁরা সত্যিই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্য কাজ করতে চান। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের বিধান অনুযায়ী উপজাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণে ভূমি, বন, বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক রীতিনীতি ও প্রথা ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে জেলা পরিষদ। শুধু তাই নয়, ভূমি রাজস্ব, প্রাথমিক শিক্ষা ও রীতিনীতি বা প্রথা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা জেলা পরিষদের। তাই জেলা পরিষদের সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং পরিষদের বিভিন্ন উদ্যোগে জনসাধারণের আরও বেশি করে অংশগ্রহণ এ মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন। আর নির্দিষ্ট সময় অন্তর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার একটা নিরপেক্ষ ও যথাযথ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনাও একান্তভাবে প্রয়োজন। একমাত্র তাহলেই বোঝা যাবে উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে গঠিত স্বশাসিত জেলা পরিষদগুলি আদৌ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে কি না। ❑

[লেখক NEHV, শিলং-এর সহযোগী অধ্যাপক এবং আইন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান।
email : drchintamanirout@gmail.com]

সহায়ক সূত্র :

Aggarwal Adish C., Constitution of India, Amish Publications, New Delhi, 2014
Hansaria, B.L., Sixth Schedule to the Constitution of India, Third Edition, Universl Law Publishing Company, New Delhi
Jyrwa, e.,The Khasi and Jaintia Hill District and Khasi States within the framework of the Sixth Schedule, Osmon Publications, New Delhi,1997
Gassa, L.S., The Autonomous District Councils Omsons Publicaton, New Delhi
Jain, M. P., Indian Constitutional Law, Lexis Nexis Butterworth, Wadhwa Publication, Nagpur
Shukla,V.N., Constitution of India, Eastern Book Co. Lucknow
Narwani, G.S., Tribal law in India, Rawat Publication, Jaipur, 2004
Statutory and other authority
Constitution of India
Report of the Steering Committee on Empowering the Scheduled Tribes for the Tenth Five Year Plan (2002-2007), Planning Commission, Government of India (2001)

উত্তর-পূর্ব ভারত : জীববৈচিত্রের এক আশ্চর্য জগৎ

জীববৈচিত্রের নিরিখে একটা আলাদা স্থান করে নিয়েছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। এখানকার অনুকূল পরিবেশ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিপুল বৈচিত্রকে লালন করে এসেছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও মানবসভ্যতার চাপে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অনেক প্রজাতি প্রায় অবলুপ্ত হয়ে এলেও এখনও এই অঞ্চল জীববৈচিত্রের স্বর্গরাজ্য। আলোচনা করেছেন **ড. অরূপ কুমার মিশ্র।**

বিভিন্ন দেশের জীববৈচিত্রের ধরন বা জৈব-ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিচারে জৈব জগতের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অসংখ্য প্রজাতির বাসভূমি এমন 'অনন্ত বৈচিত্রময়' যে ১২টি দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে ভারত তার মধ্যে অন্যতম। এই তালিকায় অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল, কলম্বিয়া, চীন, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, রুশ কনফেডারেশন, ইন্দোনেশিয়া, ভেনেজুয়েলা, আমেরিকা, ইকুয়েডর এবং অস্ট্রেলিয়া। ভারতে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর বিপুল বৈচিত্র বিশ্বের জীববৈচিত্র সম্পর্কিত যে কোনও গবেষণার পক্ষেই একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে। উত্তরে বরফাবৃত হিমালয় পর্বতমালা থেকে শুরু করে দীর্ঘ সমতলভূমি পার হয়ে দক্ষিণে সমুদ্র, অন্যদিকে দ্বীপপুঞ্জ, ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য, উষ্ণ মরুভূমি আর পাললিক সমভূমির সহাবস্থান এই উপমহাদেশে বিপুল জীববৈচিত্রের এক আদর্শ পরিবেশ রচনা করেছে।

ভারতের এই বৈচিত্রময় পরিবেশ ও প্রকৃতির মাঝে জীববৈচিত্রের দিক থেকে একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিম এই আটটি রাজ্যকে নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলে বিশ্বের প্রধান তিনটি জৈব ভৌগোলিক অঞ্চলের অবস্থান, যথা, ইন্দো-মালয়, ইন্দো-চীন ও ভারতীয় অঞ্চল। জলবায়ুগত, মৃত্তিকাগত ও উচ্চতাজনিত প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম বৈচিত্রের জন্য এই অঞ্চলের জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জগতের বৈচিত্র আন্তর্জাতিক মহলেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭০ শতাংশ এলাকাই পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এবং বাকি ৩০ শতাংশ এলাকা ব্রহ্মপুত্র ও বরাক উপত্যকার অন্তর্গত। সব মিলে এই অঞ্চল জীববৈচিত্রের এক আশ্চর্য জগৎ। এই অঞ্চলে শুধু মেরুদণ্ডী প্রাণীজগতের মধ্যেই যে কত রকমের বৈচিত্র রয়েছে তা ভেবে অবাক হতে হয় (দ্রষ্টব্য সারণি-১)।

সারণি-১

রাজ্য	স্তন্যপায়ী প্রাণী	পাখি	সরীসৃপ	উভচর	মাছ
অরুণচলপ্রদেশ	২৪১	৭৩৮	৭৮	৩৯	১৪৩
আসাম	৮৪১	১৯২	১২৮	৬৭	২৩২
মণিপুর	৬৯	৫৮৬	১৯	১৪	১৪১
মেঘালয়	১৩৯	৫৪০	৯৪	৩৩	১৫২
মিজোরাম	৮৪	৫০০	৭১	১৩	৮৯
নাগাল্যান্ড	৯২	৪৯২	৬২	১০	১০৮
সিকিম	৯২	৬১২	৩১	২১	৬৪
ত্রিপুরা	৫৪	৩৪১	৩২	২০	১২৯

তথ্যসূত্র : ভার্টিব্রেটস অব আসাম, ২০১৫, আসাম সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিল এবং আসামের ENVIS সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জীববৈচিত্র

প্রাচ্য এবং এশীয় ভূ-প্রাণীসম্পদ (Zoo-geographical) অঞ্চলের মাঝামাঝি অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় একই সঙ্গে রয়েছে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য, পর্ণমোচী বনাঞ্চল, নদী তীরবর্তী তৃণভূমি, বাঁশের ঝোপঝাড় এবং অসংখ্য জলাভূমি। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নবীনতম। নবীন হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপত্তি লাভের পর তিব্বত ও ভারতের মধ্যে দিয়ে ২৮৮০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে এই নদী। কোনও কোনও জায়গায় এই নদীর বিস্তার অবাক করে দেওয়ার মতো। ডিব্রুগড়ের কাছে উচ্চ আসামে এই নদী ১৬ কিলোমিটার চওড়া। আবার নিম্ন আসামে গুয়াহাটিতে এই নদীর বিস্তার মাত্র ১.২ কিলোমিটার। মূলত হিমবাহের জলে পুষ্ট এই নদী পলি সঞ্চয়ের নিরিখে বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। বছরে এই

নদীর পলি সঞ্চয়ের মাত্রা ৮৫২.৪ টন/কিলোমিটার[২]। অন্যদিকে, ব-দ্বীপ অঞ্চলে জলপ্রবাহের মাত্রার বিচারে আমাজনের পরই ব্রহ্মপুত্রের স্থান।

মোটামুটি ৫৬,৩৩,৯০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মূলত পাললিক সমভূমি। উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে বনভূমি ধ্বংসের ফলে একসময় ব্যাপক নদী ভাঙন দেখা দেয়। এই ভাঙনে উপত্যকার একটা বড় অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক ভূগোলের বিচারে উত্তরে পাহাড়ের পাদদেশ, উত্তর ও দক্ষিণের সমভূমি, বন্যাপ্লাবিত সমভূমি (ফ্লাডপ্লেন) ও চর এলাকা এবং দক্ষিণে পাহাড়ের পাদদেশ—উপত্যকার এই চারটি বিশেষ অঞ্চল অসংখ্য জীবপ্রজাতিকে লালন করে জীববৈচিত্রের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। কাজিরাঙা, মানস, ডিব্রু-সইখোয়া, ওরাং এবং নামেরি—এই পাঁচটি জাতীয় উদ্যানেই আসামের উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অসামান্য বৈচিত্রের সবচেয়ে ভালো ছবিটা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে প্রথম দুটি জাতীয় উদ্যান ইউনেস্কো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'-এর মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়াও, পবিতোরা, গরমপানি, গিবন, বুরাসাওপ্রি, চক্রশিলা, সোনাই-রূপাই, বরনদী, লাওখোয়া, জয়ডিহিং পানিডিহিং-এর মতো বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে বহু বিচিত্র প্রজাতির প্রাণী ও পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে। একশৃঙ্গ গন্ডারের বাসভূমি হিসাবেই মূলত কাজিরাঙার খ্যাতি। এছাড়াও এই অভয়ারণ্যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, বুনোমোষ, মাছরাঙা ও বিচিত্র সব পাখির বাস। অন্যদিকে মানস অভয়ারণ্যে বহু বিরল প্রজাতির পশুপাখির দেখা মেলে, যেমন, সোনালি লেঙ্গুর, পিগমি হগ, হুলক গিবন, এছাড়াও পাখিদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফ্লোরিকান, প্যারটবিল, আইবিস, ইগ্রেট, হেরন, করমোর‍্যান্ট, ফিশিং ঈগল ইত্যাদি। ভারত ও ভুটানের সীমা দিয়ে বয়ে গেছে মানস নদী। এই নদীই দুটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই নদীতে এখনও গাঙ্গেয় ডলফিনের দেখা মেলে। একমাত্র নামেরি জাতীয় উদ্যানেই বিশ্বের শেষকিছু সাদা ডানার উড ডাকের অস্তিত্ব এখনও টিকে রয়েছে। এই উপত্যকার প্রতিটি সংরক্ষিত এবং জনমানবহীন এলাকাতেই প্রকৃতির কোনও না কোনও অজানা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। যেমন, গুয়াহাটি শহরের মধ্যেই দীপরবিলে (একটি রামসার তালিকাভুক্ত জলাভূমি) সাদা ঝুঁটির রেডস্টার, ফকটেল, করমোর‍্যান্ট রুডি শেলডাকের মতো পরিযায়ী পাখিদের মেলা লেগেই থাকে। বিশালকাণ্ডবিশিষ্ট গাছের অরণ্য এবং বাঁশ আসামের একেবারে নিজস্ব সম্পদ। কিন্তু নির্বিচারে গাছ কাটা এবং রাজ্যের বিভিন্ন অংশে জঙ্গিদের কার্যকলাপের ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। এরপর নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে গাছ কাটার ওপর পুরোপুরি নিষেধাজ্ঞা জারি করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে আবার কয়েকশো প্লাইউড সংস্থার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গত দুই দশক ধরে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ রাজ্যের অর্থনীতি। তবে এখনও এই উপত্যকার শালগাছ, বিরল প্রজাতির সব অর্কিড, বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ গাছ ছাড়াও বিভিন্ন ফলের গাছ ও অন্যান্য গাছের খ্যাতি দেশজোড়া। এছাড়া নহর (Messua Ferrea), হলক (Terminatia Hollock), সাই (Shorea Robusta), মেকাই (Shorea Assamica), চাম (Artocarpus Chaplasha), বানসোম (Phoebe), বকুল (Minosopelengi), টিক বা সেগুন (Tactonagrandis), সিলিখা (Terminalia Chebula), ভোমোরা (Terminalia bellerica), অর্জুন (Terminalia Arjunica), সোনারু (Cassia alata), সিমালিয়া (Salmolia Malabarica), কদম (Kadamba), গামারি (Gmellina Arborea), অগর (Aquillaria Agallocha)-এর মতো গাছ আসামের যত্রতত্রই চোখে পড়ে। বাঁশ, নহর, বকুল, চাম ও আম ইত্যাদির মতো চিরহরিৎ গাছ এবং টার্মিনালিয়া প্রজাতির আধা চিরহরিৎ গাছের সারি বনাঞ্চলকে সবসময় সবুজ আচ্ছাদনে ঢেকে রাখে। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী নীচু জমিতে দেখা যায় সাভানা জাতীয় লম্বা তৃণভূমি।

বরাক উপত্যকার জীববৈচিত্র

আসামের দক্ষিণে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি প্রশাসনিক জেলাকে নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকা জীববৈচিত্রের নিরিখে ইন্দো-বর্মা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এবং এককথায় এই উপত্যকা জীববৈচিত্রের আঁতুড়ঘর। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো বরাক উপত্যকাও আদতে পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চল। বহু বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বাস এখানে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো এখানেও প্রচুর চা বাগান রয়েছে। এখানকার মাটিতে গাছপালার বৃদ্ধি হয় অতি দ্রুত। ৬৯৬২ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এই উপত্যকার এদিকে-ওদিকে বহু ছোট ছোট পাহাড় (যেগুলির সর্বোচ্চ উচ্চতা ১০০ মিটার) বা টিলার দেখা মিলবে। উপত্যকার মধ্যভাগে রয়েছে অজস্র জলাজমি, বিল, ঝিল যেগুলি এই অঞ্চলের একেবারে নিজস্ব জলাভূমি বলেই পরিচিত। বরাক তো বটেই, সেই সঙ্গে এর বিভিন্ন উপনদী যেমন, জিরি, মধুরা, জাটিঙ্গা, লরাঙ, সোনাই, রুকনি, ঘাগরা, ধলেশ্বরী ও কাটাখালের জলেও পুষ্ট হয় দক্ষিণ আসাম সেই সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় বিপুল বৈচিত্র। বরাকের দুই তীরেই অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ দেখা যায়।

বরাক উপত্যকাভূমির গাছপালাতেও রয়েছে অনেক বৈচিত্র। চিরহরিৎ অরণ্য, আধা-চিরহরিৎ অরণ্য, মিশ্র আর্দ্র পর্ণমোচী অরণ্য, ছোট ছোট গাছের ঝোপঝাড়, ধ্বংসপ্রায় বনভূমি, কৃষিজমি ও চা বাগানের পাশাপাশি অবস্থান এই উপত্যকায়।

এই উপত্যকায় ১৪টি সংরক্ষিত অরণ্য এবং একটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে এবং সেটি হল বড়ইল অভয়ারণ্য। 'ধলেশ্বরী' অভয়ারণ্যটি এখন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে।

বরাক উপত্যকার এই ঘন জঙ্গল ও পাহাড়ে বাঘ, হাতি, মালয়ান ক্যাপড লেঙ্গুর, হুলক গিবনের বাস। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ও মানুষের লোভের ফলে এই উপত্যকার উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এখানকার অতি বিখ্যাত এশীয় হাতি (এশিয়ান এলিফ্যান্ট) এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। এছাড়াও, এককালে এখানকার বনে-বাদাড়ে যে হুলক গিবন, ফাইরিস লিফ মাংকি, পিগ টেলড ম্যাকাকা, স্টাম্পড টেলড ম্যাকাকা, কিংবা মাস্কড ফিনফুটের রাজত্ব ছিল এখন সেগুলিকে প্রায় দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হয়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মতো বরাক উপত্যকাও একই রকম পরিবেশ যথা বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত বিপর্যয়ের শিকার।

মাজুলি দ্বীপের জীববৈচিত্র

১২৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট মাজুলি একসময় বিশ্বের বৃহতম নদী-দ্বীপের মর্যাদা পেয়েছিল। এই দ্বীপে ১.৫ লক্ষের বেশি মানুষের বাস। আসামের এই নদী-দ্বীপে বৈষ্ণবীয় ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জোয়ার এসেছে তার উৎস রয়েছে সেই ষোড়শ শতকে। কিন্তু দক্ষিণ তীরে ব্যাপক নদী ভাঙন ও উত্তর তীরে বাঁধগুলি (চ্যানেল বার) ভেঙে জল ঢোকার ফলে এই দ্বীপের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই ব্যাপক ভাঙনের দরুন বর্তমানে এই দ্বীপের আয়তন এসে দাঁড়িয়েছে ৪২৫ বর্গকিলোমিটারে যেখানে জমির উচ্চতা সমুদ্রতল (MSL বা মিন সি লেভেল) থেকে ৬০ থেকে ৮৫ মিটারের মধ্যে।

খেরকুটিয়া সুতি, উত্তরে সুবনসিরি এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এই দ্বীপকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে। এই নদীগুলির জলেই পুষ্ট হয়েছে এই দ্বীপের প্রায় ১৫৫ ছোট-বড় জলাভূমি। দ্বীপের একঘেয়ে সমতলের মধ্যে এই জলাভূমিগুলিই অন্যরকম বৈচিত্রের আস্বাদ এনে দিয়েছে। যাঁরা পাখি দেখতে ভালোবাসেন বা পাখি নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের কাছে মাজুলি এককথায় স্বর্গরাজ্য। নানান প্রজাতির সারস, পেলিক্যান, ক্রেন, হুইসলিং টিলের অবাধ বিচরণ এখানে। এখানকার জলাভূমিতে কিছু বিশেষ প্রজাতির স্থানীয় মাছ পাওয়া যায়, যেমন বাডিস বাডিস (Badis badis), চাকা চাকা (Chaca chaca), ওম্পক পাবো (Ompok pabo), চান্না বার্কা (Channa barca), তোর তোর (Tor tor), চিতলা চিতলা (Chitala chitala)। এগুলি ছাড়াও, এখানে এমন ১৫টি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায় যেগুলির বিশেষ ঔষধিগুণ রয়েছে এবং মিসিং, নেপালি, দেওরি, কাছড়ি ও কোচ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন রোগব্যাধির চিকিৎসায় এইসব মাছের ব্যবহার প্রচলিত।

মাজুলির জলাভূমির মাটিতে ধানচাষ এক বিরাট কর্মকাণ্ডের জন্ম দিয়েছে। এখানে প্রায় কোনও রকম রাসায়নিক সার বা কীটনাশকের ব্যবহার ছাড়াই ১০০-রও বেশি প্রজাতির ধানচাষ হয়। সমগ্র আসাম রাজ্যেই এই নদীদ্বীপ একটা স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে। এখানকার আলেঙ্গি চাপোরি, কমলাবাড়ি মিসিং, কমলাবাড়ি সত্র, সুনিয়া চাপোরি টুনিমুখ গ্রামের জীববৈচিত্রের আকর্ষণে দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক ছুটে আসেন এই দ্বীপে। পক্ষীবিশারদরা মাজুলিতে ২৫০-এরও বেশি পক্ষী প্রজাতির অস্তিত্ব চিহ্নিত করেছেন। তবে এদের মধ্যে স্পট বিলড পেলিক্যান, ছোট হাড়গিলে, বড় হাড়গিলে, বেঙ্গল ফ্লোরিক্যান, সাদা পিঠ ও সরুচঞ্চুবিশিষ্ট শকুন এবং পাল্লা-স ফিশ ঈগলেরই দেখা মেলে বেশি।❑

[লেখক আসাম সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিলের অধিকর্তা।]

উল্লেখপঞ্জি :

1. "Tectonic controls on the morphodynamics of the Brahmaputra River System in the Upper Assam Valley"; Lahiri and Sinha; Geomorphology (2012)
2. www.biologydiscussion.com/essay/impact-of-floods-on-biodiversity-in-the-brahmaputra-valley/2111
3. Review of Biodiversity of North East, S. Chatterjee, A Saikia, P Dutta, D Ghosh, S Worah
4. asmenvis.nic.in (Official website of ENVIS Assam Node at ASTEC)
5. en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity_of_Assam

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামোর চালচিত্র

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রভূত সম্ভাবনা বর্তমান। এই অঞ্চলের পরিকাঠামোর আশু বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন 'পুবের সঙ্গে কাজ করো' বা 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির সুষ্ঠু রূপায়ণে বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমান নিবন্ধে এই দিকে আলোকপাত করে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামো বিকাশে গৃহীত প্রয়াসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন **ড. কৃষ্ণ দেব।**

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিজস্ব সমস্যা এবং ১৯৪৭-এ দেশভাগের ফলে দেশের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটা এর পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বড় সমস্যা। স্বাধীনতার আগে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল; আর পূর্বের সঙ্গে যুক্ত ছিল বার্মা অধুনা মায়ানমার-এর মাধ্যমে। সে সময় সড়ক ও রেল পরিকাঠামো ব্যবস্থা আকাঙ্ক্ষিত মানের অনেক নীচে ছিল। তবুও তখনকার পরিস্থিতি এখনকার তুলনায় অনেক ভালো ছিল। কেননা এখন ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে স্থলভাগের যোগাযোগটা হল শিলিগুড়ির সংকীর্ণ সাতাশ কিলোমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট 'চিকেনস নেক' বা মুরগির গলা-আকৃতির করিডোর দিয়ে। সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অধিকারটাও বন্ধ হয়ে যায়, আর এর ফলে গোটা অঞ্চলটা সমুদ্রপথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর দরুন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাজার ও উৎপাদনশীল কেন্দ্রগুলি রাজনৈতিক ভেদাভেদের জেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। গোটা অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর এর তীব্র প্রভাব পড়েছিল।

বর্তমানে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল (এন.ই.আর.)-এর সম্পূর্ণ সীমান্তই বলতে গেলে (৯৬ শতাংশ) হল আন্তর্জাতিক সীমানা, যেটা চীন ও ভুটানের সঙ্গে উত্তরে, বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণে ও পশ্চিমে এবং নেপালের সঙ্গে পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলের প্রধান বাজার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে দেশের অন্য অংশের ভূ-রাজনৈতিক দূরত্ব উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কাঠামোগতভাবে বিরাট ক্ষতি সাধন করেছিল।

আজ গোটা বিশ্ব অর্থনীতির ক্ষেত্রে উদীয়মান এক তৎপরতা কেন্দ্র, পূর্বাঞ্চলের দিকে তাকিয়ে আর উত্তর-পূর্ব ভারত থেকেই কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শুরু। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং বাজারকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে পরিবহণগত যোগাযোগ এবং পরিকাঠামোর অন্যান্য দ্রুত বিকাশ ঘটানো সব থেকে প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আন্তঃঅঞ্চল, অঞ্চলের মধ্যস্থ এবং আঞ্চলিক যোগাযোগটা বিশেষ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটানোটা অনেকাংশেই কূটনীতি নির্ভর এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সীমান্ত পরিকাঠামো ও বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতি এখনও প্রধানত কৃষি ভিত্তিক আর শিল্প ক্ষেত্র এখানে মূলত চা, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনি ও ইস্পাতের ফেব্রিকেশন সংক্রান্ত কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে এটা আদৌ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পূর্ণ সম্ভাবনার ধারেকাছেও নেই। অপর্যাপ্ত আঞ্চলিক বিকাশের ফলে এ অঞ্চলে বিরাট সম্পদের যে ভাণ্ডার রয়েছে, তা প্রায় কাজে লাগানোই হয়নি। আর সেই জন্যই কর্মসংস্থানের চাপটা পুরোটাই হল পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর। পরিবহণগত সংযোগ তাই এ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত চাপ কমিয়ে ফেলতে পারে আরও সুষম বিকাশে উৎসাহ জুগিয়ে।

বিভিন্ন সরকারের একটি প্রধান প্রয়াস, যেমন ১৯৯১-এর 'পুবে তাকাও নীতি' এবং ২০০০ সালের উত্তর-পূর্বাঞ্চল শিল্প ও বিনিয়োগ উন্নয়ন নীতি এবং ২০০৮-এ প্রকাশিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বপ্ন (ভিশন) ২০২০, প্রভৃতির সবকটি সঠিক দিশায় গৃহীত প্রয়াস। কিন্তু এগুলিকে সুসমন্বিত চেষ্টার দ্বারা সাফল্যের তীরে নিয়ে যেতে হবে। এর আগে যোজনা ক্ষেত্রের বিনিয়োগ সত্ত্বেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো বিকাশের হার অত্যন্ত খারাপ। যেটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভিশন ২০২০ মূল নথিতে বর্ধনশীল বিকাশের ক্ষেত্রে একক বৃহত্তম প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান সরকার ভারতের পুবে তাকাও নীতির প্রতি উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪-র নভেম্বরে মায়ানমারে আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির গোষ্ঠী আশিয়ানের শীর্ষ বৈঠকে ভারত-সংলগ্নতা উদ্‌যাপন সংক্রান্ত উদ্বোধনী ভাষণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দশ সদস্য বিশিষ্ট আশিয়ান গোষ্ঠীর গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই নীতির তিনটি প্রধান স্তম্ভ হল বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও যোগাযোগ। তিনি বিশ্বকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারত কেবলই 'পুবের দিকে তাকিয়ে' নেই, এখন একই সঙ্গে পুবের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। আর তাই ভারতের এখনকার নীতিই হবে 'পুবের সঙ্গে কাজ করা'। 'পুবের সঙ্গে কাজ করা' নীতির উদ্দেশ্য হল এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং কৌশলগত বন্ধন গড়ে তোলা দ্বিপাক্ষিক আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে নিরন্তর সম্পর্কের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য-গুলির অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠা।

পুবের সঙ্গে কাজ করো বা অ্যাক্ট ইস্ট নীতির অঙ্গ হল একদিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আর অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলা আর তারই সঙ্গে যোগাযোগ পরিকাঠামো তৈরি করা। যতদিন পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও সেই সঙ্গেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগমূলক পরিকাঠামোর সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিকাশ না ঘটবে (সড়ক, রেল ও অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ, টেলি যোগাযোগ, বিমানবন্দর ও বিদ্যুৎ তৈরি) ততদিন পর্যন্ত এই নীতির অন্য স্তরে বা বৃহদাকার পর্যায়ে কার্যকারিতার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হবে না।

এই সঙ্গেই মেক ইন ইন্ডিয়া আহ্বানে উৎসাহিত হয়ে 'মেক ইন নর্থ ইস্ট' বা 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তৈরি করো' শীর্ষক একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। এই 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তৈরি করো' প্রয়াসটি শুধু যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আয় বাড়াবে তাই নয়, সেই সঙ্গে ওই অঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়িয়ে যুব শক্তির কাজের খোঁজ অন্যত্র যাওয়ার

স্রোতটাও বন্ধ করবে—যেটা বর্তমানে হয়ে চলেছে। এই প্রয়াসের ফলে শুধু যে শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নয়ন ঘটবে তাই নয়, উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের মূল স্রোতের শরিক করে তুলবে।

এই সঙ্গেই উত্তর-পূর্বাঞ্চল নতুন স্টার্ট আপগুলির ভাবী ঠিকানা হয়ে উঠতে চলেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের নেওয়া এই পরিকল্পনার সুন্দর বৈশিষ্ট্য হল দু'বছর কর ছাড়ের সুবিধা আর তিনমাসের প্রস্থানকাল। এটি নতুন শিল্পোদ্যোগীদের আর্থিক দায়ভারের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ছাড় হিসেবে কাজ করে। সব মিলিয়ে এইসব ছাড়ের ফলে ভেঞ্চার তহবিলের ভূমিকা নেবে। এতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিয়োগের ক্ষমতা এবং আয় শুধু বাড়বে তাই নয়, এই সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এই অঞ্চলে এসে উন্নয়নে শামিল হওয়ার প্রেরণা জোগাবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে রেল, সড়ক, বিমান ও জলপথে যোগাযোগ বাড়াতে যেসব প্রধান প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল।

সড়ক

(ক) বিশেষ ত্বরান্বিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এস.আর.ডি.পি.—এন.ই. কর্মসূচিটির লক্ষ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এই বিশেষ কর্মসূচিগুলি প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজধানী ও জেলা সদরগুলির যোগাযোগ গড়ে তোলা—তিনটি পর্যায় বিশিষ্ট এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের ৮৮টি জেলা সদর নিকটবর্তী জাতীয় সড়কের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। এটি হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এখন পর্যন্ত গৃহীত সবথেকে বড় কর্মসূচি। রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি অব ইন্ডিয়া, রাজ্যের পূর্ত দফতর এবং সীমান্ত সড়ক সংস্থা বি.আর.ও.। এর উদ্দেশ্যগুলি হল—

- জাতীয় মহাসড়কের বর্তমান সড়কগুলিকে দু'লেন থেকে চার লেন করা।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮৮টি জেলা সদর শহরকে অন্তত দু'লেন বিশিষ্ট সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করা।
- উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পিছিয়ে থাকা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির জন্য সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা করা।
- সীমান্ত এলাকায় কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণ।
- প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের উন্নতি ঘটানো।

এই কর্মসূচিটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে রূপায়িত করা হবে এই ভাবে :

১) এস.এ.আর.ডি.পি.—এন.ই. : সরকার অনুমোদিত প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৪,০৯৯ কিলোমিটার সড়ক তৈরি করা হবে (জাতীয় সড়ক ২০৪১ কিমি, ২০৫৮ রাজ্য সড়ক)। ২০১৫-এর আগস্ট পর্যন্ত ২৯৮৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং এর মধ্যে ১৫৮৫ কিলোমিটার রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের কাজ ২০১৭-র মার্চ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২) এস.আর.ডি.পি.—এন.ই.-র দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৭২৩ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করার কথা। (১২৮৫ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক এবং ২৪৩৮ কিলোমিটার রাজ্য সড়ক)। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর এই কাজ শুরু হবে (যা ২০১৭-র মার্চ নাগাদ শেষ হওয়ার কথা)।

৩) সরকার অরুণাচলপ্রদেশের জন্য রাস্তা ও মহাসড়কের যে প্যাকেজ-কে অনুমোদন দিয়েছে, তার আওতায় ২৩১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথের বিকাশ হবে (১৪৭২ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ও ৮৪৭ কিলোমিটার রাজ্য/সাধারণ/কৌশলগত পথ)। ৭৭৬ কিলোমিটার রাস্তার প্রকল্পের জন্য বিওটি (বার্ষিক) মডেল প্রযোজ্য হবে আর বাকিটা হবে চুক্তিভিত্তিক নির্ধারিত মূল্যে। আগস্ট ২০১৫ পর্যন্ত ১৫৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ২৩০ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই অরুণাচলপ্রদেশ প্যাকেজ-এর কাজ মার্চ ২০১৮-র মধ্যে শেষ করে ফেলার লক্ষ্য রয়েছে।

(খ) পূর্ব-পশ্চিম করিডোর—এস.এ.আর.ডি.পি.-এন-ই. ছাড়াও ন্যাশনাল হাইওয়েজ অথরিটি এন.এইচ. এ.আই. আসাম-পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুর থেকে আসামের শিলচর পর্যন্ত ৬৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ পূর্ব পশ্চিম করিডোরকে চার লেনে উন্নীত করার দায়িত্বে রয়েছে। আর এই সঙ্গেই মেঘালয়ের জোয়াই থেকে রাতেচেরা পর্যন্ত ১০৪ কিলোমিটার রাস্তা এন.এইচ.ডি.পি.-র আওতায় নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে। এই করিডোরটির কাজ ডিসেম্বর ২০১৪-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

আসামের পূর্ব-পশ্চিম করিডোরের কাজ শেষ না হওয়ার কারণ ভূমি অধিগ্রহণ ও স্থানান্তরের সমস্যা, গাছকাটার সমস্যা, উপর্যুপরি বন্‌ধ ডাকা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ছাড়পত্র পাওয়ার সমস্যা, ঠিকাদারের অপর্যাপ্ত জনবল ও সরঞ্জাম, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায়শ নির্মাণ উপকরণ আনার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রভৃতি। আসামে পূর্ব-পশ্চিম করিডোর প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৭০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৫৮০ কিলোমিটারের কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ হবে ডিসেম্বর ২০১৬-র মধ্যে।

রেলপথ

১ এপ্রিল ২০১২-র তথ্য অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মোট রেল নেটওয়ার্ক ২৬৬১ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১৬০১ কিলোমিটার (৬০ শতাংশ) হল ব্রডগেজ (এর পুরোটাই গেজ উন্নীতকরণের ফলে)। হাতে যে সমস্ত গেজ উন্নীতকরণ প্রকল্প রয়ে গেছে, সেগুলি শেষ হলে কেবলমাত্র ২০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ পড়ে থাকবে প্রাচীন স্মৃতিমেদুর এক যুগের চিহ্ন হিসেবে।

রেল পর্যটন এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পূর্ণ মাত্রায় আসতে চলেছে। আর তারই পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পরিবেশ পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজম আর শিক্ষা পর্যটন বা এডুকেশন ট্যুরিজম চালু করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া তীর্থযাত্রীদের জন্য দেবি সার্কিট, জ্যোতির্লিঙ্গ সার্কিট, জৈন সার্কিট, ক্রিশ্চান সার্কিট, সুফি সার্কিট, শিখ সার্কিট, বৌদ্ধ সার্কিট এবং টেম্পল সার্কিটের মতো বিশেষ সার্কিটগুলি চিহ্নিত হওয়ার পরিণামস্বরূপ এইসব সার্কিটের জন্য বিশেষ প্যাকেজ যুক্ত ট্রেনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের অংশগ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হবে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান বা মহা-পরিকল্পনায় রয়েছে—সব রাজ্যের রাজধানীগুলিকে রেলপথে যুক্ত করা, এই অঞ্চলে একই গেজ-সমন্বিত ব্রডগেজ নেটওয়ার্ক চালু করা, আগামী দিনে যাত্রী ও পণ্য বৃদ্ধি সামলানোর জন্য নেটওয়ার্কের ক্ষমতা বাড়ানো, এই অঞ্চলের যুক্ত না হওয়া এলাকাগুলিতে রেল পথ সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক সীমানা শক্তিশালী করা এবং প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও যোগাযোগের উন্নতি ঘটানো।

২০১৪ সালের ১১ আগস্ট দুধনই-মেন্দিপাথার শাখার কাজ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘালয় রেল মানচিত্রে যুক্ত হল। এই অঞ্চলে আরও তিনটি রেলপথ

এই বছরেই চালু হওয়ার কথা রয়েছে। লামডিং ও শিলচরের মধ্যে ২১০ কিলোমিটার দীর্ঘ গেজ উন্নীতকরণ প্রকল্প চালু হওয়ায় দক্ষিণ আসামও এখন ব্রড গেজ নেটওয়ার্কের আওতায় এসে গেছে।

নতুন রেলপথ ডাবলিং এবং গেজ রূপান্তরের ২০টি বড় পরিকাঠামোগত প্রকল্প উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে চালু আছে। এদের দশটি হল জাতীয় স্তরের প্রকল্প। এগুলির সম্মিলিত দৈর্ঘ্য হল ২৯১৯ কিলোমিটার আর এর জন্য মোট ব্যয় ৩৮৩১০ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের রাজধানীতে ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে রেল পৌঁছে যাবে বলে আশা করা যায়।

বিমান পরিবহণ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে ১২টি বিমানবন্দর চালু রয়েছে আর একই সংখ্যক বিমানঘাঁটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এই অঞ্চলের বিমান চলাচলের হার বাড়াতে নানা স্তরে প্রচেষ্টা চলছে। শিলংয়ে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব পর্ষদ, এয়ার ইন্ডিয়ার সহযোগী সংস্থা অ্যালায়ান্স এয়ারকে ২০০২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখতে—বিশেষ করে যেসব বিমানবন্দরের বাণিজ্যিক উড়ান অপর্যাপ্ত, সেই সব ক্ষেত্রে বিমান পরিবহণের উন্নতির জন্য—বাস্তব আয়-ব্যয়ের ব্যবধান ঘোচানোর জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করেছিল (ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডিং)। এই তহবিল জোগানো এখন উত্তর-পূর্ব পর্ষদ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই বর্তমানে তেজপুর, ডিমাপুর ও লীলাবাড়িতেই কেবল এয়ার ইন্ডিয়া/অ্যালায়ান্স এয়ারের উড়ান পরিষেবা চালু আছে। তবে পর্ষদ আবার এই সব বিমানবন্দরে এবং বড়াপানিতে পরিষেবা চালু করার জন্য তহবিল জোগানোর প্রস্তাব দিয়েছে।

সরকার সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিমান পরিবহণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন বিমানবন্দরে এই ধরনের বিমান পরিবহণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে অসামরিক বিমান পরিবহণ সচিবের নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রক কমিটিও গড়া হয়েছে।

নতুন এই নীতি শুধু ভারতে বিশ্বমানের কেন্দ্র তোলার ওপরই নজর দেবে না। তার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চল-সহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলি এবং মহানগর ব্যতীত অন্যান্য শহর থেকে ক্রমবর্ধমান বিমান পরিবহণের চাহিদার দিকে নজর দিয়ে অন্তর্দেশীয় আঞ্চলিক বিমান কেন্দ্রও গড়া হবে। সরকার দেশের সুদূর ও দুর্গম এলাকাগুলিতে বিমান যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়ে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির নগরগুলিতে বিমানবন্দর গড়ে তোলা ও তার আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিচ্ছে।

অন্তর্দেশীয় জলপথ

ভারতের অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ আই.ডব্লিউ.এ.আই.-কে জাতীয় জলপথ গড়তে বলা হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে দু'নম্বর জাতীয় জলপথ গড়তে ধুবড়ির কাছে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে (ব্রহ্মপুত্র নদে) সদিয়া পর্যন্ত এই জলপথ গড়া এবং লক্ষ্মীপুর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত বরাক নদীর ১২১ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথ অংশকে জাতীয় জলপথের অংশ হিসেবে গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দু'নম্বর জাতীয় জলপথের সঙ্গে নানা অন্তর্দেশীয় জলপথকে যুক্ত করতে একগুচ্ছ পরিকাঠামো বিকাশের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের প্রয়াসের ফলে দু'নম্বর জাতীয় জলপথে নানা পণ্যবাহী রুট এবং ফেরি পরিষেবা চালু হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দু'নম্বর জাতীয় জলপথ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি অন্য জলপথ রয়েছে, যেগুলির বিকাশ ঘটাতে পারলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ সুগম হবে এবং ভারত-মায়ানমার সীমান্ত বাণিজ্য বাড়বে।

ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল

অভ্যন্তরীণ জলপথে যাতায়াত ও বাণিজ্য পথ সংক্রান্ত ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল ১৭০০ কিলোমিটার, জাতীয় জলপথ ১ (গঙ্গা) ও জাতীয় জলপথ ২ (ব্রহ্মপুত্র)-কে যুক্ত করে এবং সেই সঙ্গে জোড়ে জাতীয় জলপথ ৬ (বরাক)-কেও। এই পথের বিকাশ উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে সুন্দরবন ও বাংলাদেশ হয়ে ভারতের অন্যান্য অংশে পণ্য পরিবহণের সুবিধা বাড়াবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য পাঠানোর পথও সুগম হবে।

কালাদান বহুমাত্রিক পরিবহণ প্রকল্প

পররাষ্ট্র মন্ত্রক এই প্রকল্পটির রূপরেখা দিয়েছে যাতে কলকাতা/হলদিয়া বন্দর থেকে মিজোরামে বিকল্প যোগাযোগ স্থাপিত হয় মায়ানমারের কালাদান নদীর মধ্য দিয়ে। এতে উপকূল বরাবর জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে হলদিয়া থেকে সিট্টোয়ে এবং সিট্টোয়ে থেকে মায়ানমারের পালেটওয়ায় পৌঁছানো যাবে আর তারপর পালেটওয়া থেকে সড়ক পথে মিজোরামে পৌঁছানো সম্ভব হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রক এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েছে। সিট্টোয়ে বন্দরটির নির্মাণের কাজ চলছে।

পরিকাঠামো বিকাশে নজর কেন্দ্রীভূত রেখে প্রকল্পগুলিকে যথা সময়ে স্থানীয় দক্ষ মানুষদের সাহায্য নিয়ে শেষ করতে পারলে শুধু যে উন্নয়নের ঘাটতি মিটবে তা নয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকার যে বোধ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মনের গভীরে সঞ্চারিত হয়েছে তারও অবসান ঘটানো যাবে।❑

[লেখক পরিবহণ ক্ষেত্রের এক বিশেষজ্ঞ, একসময় যোজনা কমিশন ও বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে উপদেষ্টা হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

email : kd.krishnadev@gmail.com]

উল্লেখপঞ্জি :

১. India Transport Report : Moving India to 2032, (2014), Routlegde, New Delhi.
২. Woking Group on Railways, Ministry of Railways, 2012, New Delhi.
৩. Working Group on Improvement and Development of Transport Infrastructure in the North East, for the National Transport Development Policy Committee, M/o DoNER, New Delhi.
৪. The Economic Times, Various Issues.
৫. The Hindu, Various Issues.
৬. The Hindu Businessline, Various Issues.
৭. http://morth.nic.in/
৮. www.pib.nic.in
৯. http://www.makeinindia.com
১০. www.narendramodi.in
১১. http://necouncil.gov.in/
১২. http://mdoner.gov.in/
১৩. www.mea.gov.in

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : শক্তিক্ষেত্রের সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

*বিশ্বের যে কোনও অঞ্চলের আর্থিক তথা সামাজিক বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হল শক্তিক্ষেত্র। যদি আমাদের দেশের কথা ধরি, বাকি অংশের তুলনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল আর্থ-সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন মাপকাঠিতে অনেকটাই পিছিয়ে এবং তার জন্য অনেকাংশে দায়ি শক্তিক্ষেত্রে ঘাটতি। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, শক্তি সম্পদ/উৎসের, বিশেষত অপ্রচলিত বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য (বিদ্যুৎ) শক্তি, যেমন—জলবিদ্যুৎ, বায়োমাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। যদিও এর ৯০ শতাংশই এখনও আমরা কাজে লাগিয়ে উঠতে পারিনি। কীভাবে এই শক্তি সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাকি অংশেরও বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব? এ কাজের রূপরেখা তৈরির জন্য কী কৌশল হাতে নিতে হবে? এই চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় কী উপায় অবলম্বন করতে হবে? এই সব দিক নিয়েই এই নিবন্ধে আলোচনা করেছেন—***কে রামনাথন।***

বিশ্বের যে কোনও ভূখণ্ডের যে কোনও অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশের জন্য একটি উচ্চমানের শক্তিক্ষেত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশের বাদবাকি অংশের তুলনায় এই অঞ্চলটি বর্তমানে বেশকিছু সংখ্যক আর্থ-সামাজিক সূচকের নিরিখে লক্ষণীয়ভাবে পিছিয়ে পড়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে মাথাপিছু আয়, বিদ্যুতের ব্যবহার, শিল্পায়ন ইত্যাদি। সিকিম ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাকি সব কয়টি রাজ্যেই বিদ্যুতের ঘাটতি জাতীয় গড়ের নিরিখে যথেষ্ট বেশি। বিষয়টি কিছুটা আপাতবিরোধী ঠেকাতে পারে। যে অঞ্চলে উচ্চমানের জলবিদ্যুৎ তথা অন্যান্য অপ্রচলিত শক্তি উৎসের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার রয়েছে, সাক্ষরতার হার যথেষ্ট বেশি এবং আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ শ্রেণির মর্যাদা পেয়ে থাকে, সেই অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ঘাটতি বিষয়টি বিসদৃশই বটে। এই অঞ্চলের শক্তি-ক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ ঘটলে তা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠবে। ফলত, দেশও অনেক দিক থেকে লাভবান হবে।

তবে শক্তিক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ সুনিশ্চিত করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতার বাস্তব পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে এজন্য একটি বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে যেসমস্ত বিষয়ে জোর দিতে হবে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় কয়েকটি হল—সম্ভাবনাপূর্ণ অথচ অব্যবহৃত শক্তি সম্পদের বিকাশে জোর দেওয়া; সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে শক্তির চাহিদা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির মূল্যায়ন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা; সরবরাহ এবং বণ্টন ব্যবস্থার প্রসারণ ঘটানো এবং নিয়ন্ত্রণের সুযোগ-সুবিধা; দক্ষতার মানোন্নয়ন; নীতি এবং নিয়ামক পরিকাঠামো, প্রশাসনিক পরিকাঠামো এবং মানবসম্পদের বিকাশ।

জলবিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বিকাশে গতি আনতে হবে

হিসাব অনুযায়ী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৯০ শতাংশ জলবিদ্যুৎ শক্তিই এখনও পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়নি। আর এর পরিমাণ ৫৬ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি। এই শক্তির দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের এক ব্যাপক অংশের শক্তি চাহিদা মেটাতেই সাহায্য করবে না; একই সঙ্গে এই সবুজ এবং নমনীয় শক্তি দেশের বাকি অংশের চাহিদা পূরণেও কার্যকরী ভূমিকা নেবে। এই সমস্ত পরিকল্পনা, নকশা অনুযায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়ে উঠতে পারে।

জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র গড়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন প্রায়শই হতে হয় সেগুলি হল—প্রচুর মূলধন লাগে, উৎপাদন শুরু হতেও সময় লাগে প্রচুর। এছাড়াও রয়েছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক বাসস্থানের উপর যে প্রভাব পড়ে, জনস্বাস্থ্য এবং ভূমিকম্প সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি, জনবসতি উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ইত্যাদি দিক। তালিকা এখানেই শেষ নয়। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত দিক এবং নদী তীরবর্তী জমির ক্ষেত্রে ভূমি রেকর্ড না মেলার ফলে প্রকল্প গড়তে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে ঠিকঠাক চিহ্নিত করে ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ছাড়পত্র পেতে বিলম্ব এবং অনুন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই ধরনের প্রতিকূলতার ফলস্বরূপ, প্রকল্পের সময়সীমা এবং ব্যয়ভার অনিবার্যভাবেই বেড়ে যায়। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থেও এই দীর্ঘসূত্রিকার কারণে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। সম্প্রতি TERI-এর তরফে একটি প্রকল্প নির্মাতাদের জন্য সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। সমীক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিচিত্র ধরনের

ভীতির ছবি ধরা পড়ে। তারা মনে করছিলেন এই প্রকল্প গড়ে উঠলে তাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য হারিয়ে যাবে। আংশিক মুদ্রা অর্থনীতি থেকে পুরোপুরি মুদ্রা অর্থনীতিতে পরিবর্তন সংক্রান্ত উদ্বেগও তাদের মধ্যে গেড়ে বসেছিল। এবং এগুলি প্রায়শই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে সব তথ্যাদি (Hydrology data) পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে প্রকল্পের নকশা (design) তৈরি করাটাও বাস্তবে খুব বেশি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আকছার জল-আবহ (বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া সম্বন্ধীয়) সংক্রান্ত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়।

উপরে আলোচিত এইসব প্রতিকূল বিষয়গুলি বেশ জটিল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে স্পর্শকাতর। তাই অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে এর মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষভাবে নজর দিতে হবে নিম্নলিখিত পন্থাপদ্ধতির উপর।

(i) প্রকল্প গড়ার সময় প্রতিটি নদীর অববাহিকার জন্য আলাদা আলাদা নকশা তৈরি এবং প্রকল্প রূপায়ণের সময় সমন্বয় রেখে চলতে হবে।

(ii) (জল) সম্পদের অসুরক্ষিত দিকগুলি চিহ্নিত করে একটি ব্যাপকতর ম্যাপ তৈরি।

(iii) প্রতিটি প্রাসঙ্গিক ধাপে প্রকল্পের সুস্থায়িত্বের পর্যালোচনা এবং তা করতে হবে আন্তর্জাতিক জলবিদ্যুৎ অ্যাসোসিয়েশন-এর খসড়া (International Hydropower Association's Protocol)-এর আদলে তথা স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে।

(iv) স্বচ্ছতা এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিবেশগত প্রভাবের মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষা।

(v) অবাধ এবং ত্বরান্বিত ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যবস্থা।

(vi) স্থানীয় জনসাধারণ এবং নাগরিক সমাজকে প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত করার জন্য একটি অতি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং নদী তীরবর্তী জমি সংক্রান্ত ইস্যুগুলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানকে আরও খোলামনে/উদারতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

অন্যান্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিসম্পদের বিকাশ

ক্ষুদ্রায়তন জলবিদ্যুৎ (Small Hydropower—SHP), জৈবগ্যাস (Biomass), সৌরশক্তি ইত্যাদির মতো অন্যান্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎসের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে দূরান্তের প্রান্তিক বসতিগুলিতে বিদ্যুতের জোগান বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখনও এক হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্রায়তন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। যার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে ২ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের জোগান। গোবর গ্যাসের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। যদি একে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তবে গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের বিষয়ে আক্ষরিকভাবেই তা অত্যন্ত সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। সৌরশক্তিকে ব্যবহার করারও যথেষ্ট উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি শহরকে সৌরশহর (Solar City) হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মাস্টার প্ল্যান ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। নতুন এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (Ministry of New and Renewable Energy)-এর সৌর শহর বিকাশ কর্মসূচি (Solar City Development Programme) অংশ হিসাবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলা এবং আইজল শহরকে পাইলট সোলার সিটি হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিসম্পদের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার রয়েছে, এটি যেমন সত্যি একই সঙ্গে মুদ্রার অন্য দিকটি হল এই সম্পদের দ্রুত বিকাশ ঘটিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধাও রয়েছে পাহাড় প্রমাণ। প্রকল্পগুলির প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থান, প্রকল্প অঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের উচ্ছেদ সংক্রান্ত সমস্যা, এ ধরনের প্রকল্পে পুঁজি ঢালতে বিনিয়োগকারীদের অনাগ্রহ, প্রকল্প রূপায়ণের জন্য সঠিক ব্যবসায়িক মডেল এইসব অন্তরায় এর অন্যতম। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের শক্তিসম্পদের এক সামগ্রিক পর্যালোচনা তথা স্থানীয় বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ চাহিদার এক বাস্তব মূল্যায়ন আবশ্যক। নকশা তৈরির সময় বাস্তবতার ভিত্তিতে গ্রিড বিহীন অথবা গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত দু' ধরনের প্রকল্পের বিষয়টিই ভেবে দেখতে হবে। প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রকল্প অঞ্চলে জনঘনত্ব তথা বিদ্যুতের চাহিদার ওঠাপড়া, প্রকল্পের অবস্থান থেকে গ্রিডের নৈকট্য ইত্যাদি দিকগুলি বিবেচনা করে সুবিধাজনক মনে হলে প্রকল্পকে গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করা যেতেই পারে। যথাযথ ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করাটাও প্রকল্প নির্মাণের সময় প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বণ্টনের জন্য দরকার সুচারু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

প্রত্যন্ত/দুর্গম এলাকায় অবস্থিত প্রকল্পগুলি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকা চাহিদাযুক্ত অঞ্চলে পাঠানোর জন্য একদিকে যেমন দরকার সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার (T&D System) ব্যাপকতর প্রসার অন্যদিকে দরকার বিপুল পুঁজি বিনিয়োগ। এমনটাও হতে পারে যে, উৎপাদন শুরুর প্রথম কয়েক বছরে সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার কম হওয়ার দরুন বিদ্যুৎ মাশুল চড়া হবে।

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, দুর্গম/কঠিন ভৌগোলিক ভূখণ্ড এবং সারা বছরের মধ্যে মাত্র কয়েক মাস কাজ করা যাবে—এইসব দিকগুলিও কিন্তু সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলবে। সুতরাং বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বণ্টন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করার সময় বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার।

(i) বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা;

(ii) বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধির এবং বাজারের গতিপ্রকৃতির পর্যালোচনা;

(iii) প্রতিটি নদীর অববাহিকার জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট বিকাশ পরিকল্পনা;

(iv) সীমাবদ্ধতাগুলিকে অগ্রাধিকারের

ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে হবে;

(v) লোকসানের পরিমাণ কমাতে হবে;

(vi) প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন একান্ত জরুরি, বিশেষত স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তিসমূহ প্রচলন;

(vii) পরিস্থিতিভিত্তিক পর্যালোচনা।

বিশাল মাত্রার পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে গ্রিড সংহত করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রিড বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার প্রতি নজর দেওয়াটাও জরুরি। এজন্য যথাযথ সরঞ্জাম সমৃদ্ধ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র (System Control Centre) গড়ে তোলাটাও সমান জরুরি।

কর্মদক্ষতা বিকাশ

যে কোনও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দক্ষতা তথা উৎপাদনের নিরিখে চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছানোর চাবিকাঠি হল চাহিদা-সরবরাহ শৃঙ্খলে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। এর জন্য বিদ্যুৎ আইন (The Electricity Act), শক্তি সংরক্ষণ আইন (The Energy Conservation Act) এবং শক্তি দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত জাতীয় মিশন (National Mission on Enhanced Energy Efficiency) ইত্যাদির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনি আজ্ঞা (Mandate) এবং সহায়তার বন্দোবস্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দক্ষতার মানোন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। সুতরাং এটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কার্যক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। যথাযথ ব্যবসায়িক মডেলের রূপরেখা তৈরি এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি—এই দুটি দিকও এই পরিপ্রেক্ষিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

নীতি এবং নিয়ামক সহায়তা

দীর্ঘমেয়াদি বিকাশের পূর্বশর্ত হল সহায়ক নীতি এবং প্রনিয়ম (Regulation)-সমূহ তথা উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা। সুতরাং বিশেষভাবে জোর দিতে হবে বহুমুখী কৌশলের প্রতি। যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার সংস্থান রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহে। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগে গতি আসবে এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংশ্লিষ্ট নীতি এবং প্রনিয়মসমূহের প্রভাব পর্যালোচনার জন্য সমীক্ষা করতে হবে। যাতে করে চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা বোঝা যায় এবং সেখানে পৌঁছাতে এই দুটি ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন তা স্পষ্ট হয়।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

নজর দেওয়ার মতো আর একটি বিষয় হল পর্যাপ্ত পরিমাণ দক্ষ মানবসম্পদের লভ্যতা। বিবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ামক সংক্রান্ত দিকসমূহে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়টির পূর্বশর্ত।

উপসংহার

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শক্তিক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ একদিকে যেমন বিবিধ সুযোগ-সুবিধা এনে দেবে, অন্যদিকে তেমনি দাঁড় করিয়ে দেবে বেশকিছু চ্যালেঞ্জের সামনে। এই সমস্যার সমাধানে দরকার একটি বহুমুখী কৌশল গ্রহণ। যেসমস্ত মূল ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হল জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকাশে সঞ্চার এবং অন্যান্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিসম্পদের যথাযথ বিকাশ ঘটানো; বাজারের সুযোগ-সুবিধার দিকটি মাথায় রেখে সরবরাহ এবং বণ্টন ব্যবস্থার বিশাল মাপের প্রসারণ; দক্ষতার মানোন্নয়ন; সুবিধাজনক নীতি এবং নিয়ামক কাঠামো তথা সুদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা সর্বোপরি মানবসম্পদের বিকাশ ঘটানো। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শক্তিক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ আরও বেশকিছু দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে পড়ছে দেশের শক্তি নিরাপত্তা বাড়ানো। পরিবেশে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। সর্বশেষে সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তিকে ব্যাপক মাত্রায় গ্রিড-এ যুক্ত করার সুযোগ করে দেওয়া।❑

[লেখক 'The Energy and Resources Institute' (TERI)-এর সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট গবেষক, পদাধিকারী।]

(নিবন্ধে ব্যক্ত মতামত একান্তভাবেই লেখকের নিজস্ব।)

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জলপথ

আমাদের দেশ নদীমাতৃক। গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা-কাবেরী-যমুনা বিধৌত ভারতে নৌ-পরিবহণের ইতিহাস হালফিলের নয়। সপ্তডিঙা মধুকরে দেশদেশান্তরে পাড়ি জমাত সদাগররা। একটা সময় অবশ্য জলপথে পণ্য ও যাত্রী চলাচল অবহেলা এবং উপেক্ষার শিকার হয়ে পড়ে। এর পরিণামে নানান সংকটে ভুগতে হয়েছে বিশেষত স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে। ইদানিং অবশ্য চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। কপাল ফিরতে চলেছে দুয়োরানি নদী-পরিবহণের। জলপথ পরিবহণ সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করতে পারলে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মুশকিল আসান হতে পারে—কলমচি **ড. বিশ্বপতি ত্রিবেদী***-র সুচিন্তিত অভিমত।*

জলপথ ব্যবহারের ধ্যানধারণা ভারতে আনকোরা নয়। গঙ্গা-যমুনায় পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ চলছে আকবরের জমানা ইস্তক। পরে, ইংরেজ শাসনকালেও বেশকিছু জলপথের বিকাশ ঘটে এ দেশে। স্বাধীনতার পর, কিন্তু গুরুত্ব বাড়ল সড়ক ও রেলপথে। মার খেল জলপথ পরিবহণ। ভারতে আছে প্রায় ১৪,৫০০ কিলোমিটার জলপথ। গত বছর অবধি সাকুল্যে ৪৫০০ কিলোমিটারকে জাতীয় জলপথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অধুনা, অন্তর্দেশীয় জলপথ পরিবহণে সরকার অবশ্য জোর তৎপর। আরও ১০৬টি জলপথ জাতীয় জলপথের মর্যাদা পেয়েছে। জাতীয় জলপথের সংখ্যা মোটে ৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১১টি। এই তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১৯টি নদনদী। নীচের সারণিতে রাজ্যওয়াড়ি নদীর নাম দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্বে এসব সদ্যঘোষিত জাতীয় জলপথ সেখানকার পরিবহণে এক সার্থক বিকল্প হয়ে উঠবে। সড়ক ও রেলপথের পাশাপাশি পরিবহণের ক্ষেত্রে এ হবে এক বাড়তি পাওনা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে জলপথ পরিবহণের সম্ভাবনা এখনও অবধি সদ্ব্যবহার করা হয়নি। জাতীয় জলপথ ২ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রে জলপথ পরিবহণের সম্ভাবনা বিস্তর। ধুবড়ি (বাংলাদেশ লাগোয়া) থেকে সাদিয়া ইস্তক ব্রহ্মপুত্রের বিস্তার ৮৯১ কিলোমিটার। পণ্য ও যাত্রী চলাচলে এই বিশাল নদকে পূর্ণাঙ্গ জলপথ হিসেবে গড়ে তোলা হয়নি।

পাশিঘাট এলাকায় ব্রহ্মপুত্রে নিয়মিত নৌ-চলাচল করে। কিন্তু বার্জ এবং নৌকো সংখ্যায় অপর্যাপ্ত। এছাড়া এগুলি তেমন একটা আধুনিক মানের নয়। ক্ষুদ্রাকৃতি এসব জলযানের যাত্রী এবং মাল পরিবহণের ক্ষমতাও কম। পাশিঘাটে তাদের যানবাহন ব্রহ্মপুত্রের এপার-ওপার করতে এই জলপথ ব্যবহার করে সেনাবাহিনীও। ব্রহ্মপুত্র অর্থাৎ জাতীয় জলপথ ২-এর শুরু ধুবড়ি। একসময় বন্দর হিসেবে এর কিছুটা নামডাক ছিল। কিন্তু তা ধরে রাখা যায়নি। এই অঞ্চলে মাছ এবং শাকসবজি বেচাকেনা হয় ঢের। এমনকী পড়শি বাংলাদেশে এসবের চাহিদা অনেকখানি মেটায় ধুবড়ি (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

রাজ্য	নদনদী/খালের সংখ্যা	নদনদী/খালের নাম
অরুণাচলপ্রদেশ	১	লোহিত
অসম	১৪	আই, বরাক, বেকি, ধানসিড়ি/কাথে, দোইং, দিখু, ডোয়ানস, গঙ্গাধর, জিঞ্জিরাম, কোপিলি, লোহিত, পুথিমারি, সুবনসিড়ি ও তালওয়াং (ধলেশ্বরী)।
মেঘালয়	৫	গানল, জিঞ্জিরাম, কিনসি, সিমসং ও উংগোট (ডাউকি)।
মিজোরাম	১	লোওয়াং (ধলেশ্বরী)
নাগাল্যান্ড	১	টিজু-জুনকি

টীকা : লোহিত, জিঞ্জিরাম এবং তালওয়াং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটির বেশি রাজ্যে বয়ে চলেছে। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১৯টি নদী।

টীকা : গঙ্গাধর আছে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে।

ভারত-বাংলাদেশ জলপথ

সদুদ্দেশ্য নিয়েই পরিকল্পকরা বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ২নং জাতীয় জলপথকে ১নং জাতীয় জলপথ (হুগলি/গঙ্গা)-এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু, সীমান্ত ইস্যু, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে নৌ-চলাচল, বাংলাদেশে জলপথ উন্নত না হওয়া, নৌ-চলাচলের উপযুক্ত জলের গভীরতা অর্থাৎ নাব্যতার অভাব (বাংলাদেশের পদ্মা নদীতে)—এসবের দরুন দু'দেশের জলপথ সংযুক্তি খুব একটা ফলপ্রসূ বা বিকাশিত হয়ে ওঠার পক্ষে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ন্যায্য মূল্যের/রেশন দোকান মারফত সরকারি বণ্টন ব্যবস্থায় চাল ও গম পরিবহণের জন্য এই জলপথ কাজে লাগানো যেতে পারে। এবং তা ব্যবহার করা উচিত। এতে ঘুরপথে মাল পরিবহণবাবদ বাড়তি লক্ষ লক্ষ টাকার খরচ বাঁচানো যাবে। কমবে সড়কপথের যানজট। ভারতের খাদ্য নিগম এ ব্যাপারে যথেষ্ট

চিত্র নং-১
জাতীয় জলপথ-২

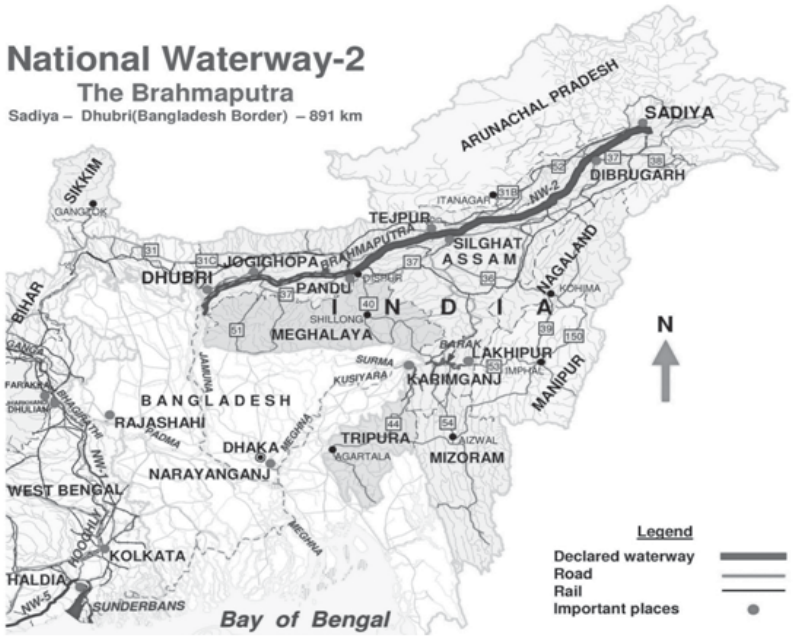

চিত্র নং-২
ভারত-বাংলাদেশ জলপথ

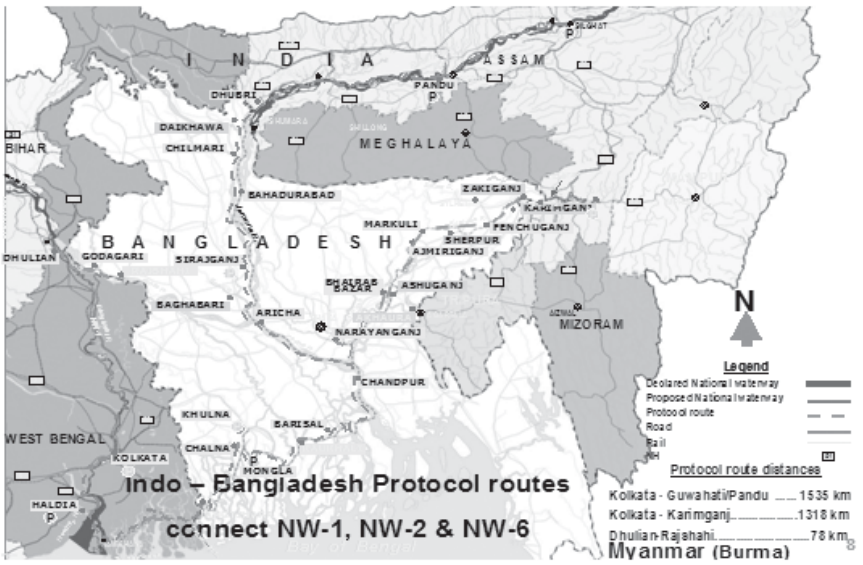

উদ্যোগ নেয়নি। গয়ংগচ্ছ মনোভাবের দরুন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কম খরচে খাদ্যশস্য পরিবহণের সীমিত প্রচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

২নং জাতীয় জলপথে বেশ কিছুদিন যাবৎ পরিকাঠামো তৈরি করছে ভারতের অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষ। তবে কাজ এখনও বিস্তর বাকি। পাণ্ডুতে রেল সাইডিং-এর সঙ্গে জেটি তৈরির কাজ শেষ। কিন্তু এখনও ইস্তক পণ্য চলাচলের পরিমাণ তেমন একটা জাঁক করে বলার কিছু নয়। ধুবড়িতে অন্তর্দেশীয় জলপথ কর্তৃপক্ষের রো রো (রোল-অন, রোল-অফ) জেটি তৈরির কাজ সমাপ্তির মুখে। কিন্তু নদীর অন্য পারে হাতসিংগমারিতে জেটি নির্মাণে কিছু কারিগরি সমস্যা মাথাচাড়া দিচ্ছে। সৌজন্যে পাড়ে ব্যাপক ধস।

দু'দেশের জলপথ চুক্তির মাধ্যমে করিমগঞ্জ এবং আশুগঞ্জে নৌ-পরিবহণও এক বা একাধিক জটে জড়িয়ে আছে।

জাহাজ মন্ত্রক উত্তর-পূর্বে আরও ১৯টি জাতীয় জলপথ ঘোষণা করায় ওই অঞ্চলে সুষ্ঠুভাবে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের জন্য সংহতভাবে নদীগুলি ব্যবহারের পরিকল্পনা ছকতে সুবিধে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে।❑

[লেখক ভারত সরকারের জাহাজ মন্ত্রকের আওতাধীন 'ন্যাশনাল শিপিং বোর্ড'-এর সভাপতি।]

প্র । চ্ছ । দ । নি । ব । ন্ধ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে দক্ষতা মিশন

আটটি রাজ্যে বিস্তৃত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল অসীম সম্ভাবনার আকর। অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য ও বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম যুবশক্তিতে বলীয়ান এই অঞ্চল একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। স্কিল ইন্ডিয়া বা দক্ষ ভারত কর্মসূচির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পরিকাঠামো নির্মাণ করে কীভাবে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক চালচিত্রের ভোল পালটে দেওয়া সম্ভব। আলোচনা করেছেন **সঞ্জীব দুগ্গল।**

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের এখনই প্রয়োজন

- ✶ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের দক্ষতা বিষয়ক ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের তরফে একটি সমর্পিত সংযোগকেন্দ্র বা Single Point of Contact—SPOC
- ✶ কার্যনির্বাহী অংশীদার NSDA, NSDC প্রভৃতির তরফে প্রতিটি রাজ্যের জন্য সমর্পিত প্রকল্প।
- ✶ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রকল্পগুলি দ্রুত কার্যকর করার লক্ষ্যে এর অর্থের জোগান সুনিশ্চিত করা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দক্ষ ভারত গড়ে তোলার যে ডাক দিয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে এই অভিযান দেশের প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিচ্ছে, সেহেতু দক্ষ ভারতের মতো প্রধান একটি সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রেও এই অঞ্চলকে যে প্রাধান্য দেওয়া হবে, এটা প্রত্যাশিতই ছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যে শুধুমাত্র একটি স্বনির্ভর অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা আছে তাই নয়, এই অঞ্চল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে 'দক্ষ ভারত' কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে কেন্দ্র সম্প্রতি এখানকার বিভিন্ন জেলায় দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান—ITI স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ বিষয়ক মন্ত্রী রাজীবপ্রতাপ রুডি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্পমহলকে দক্ষতা উন্নয়নের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। ৪০টি সেক্টরভিত্তিক দক্ষতা কাউন্সিলের প্রতিটিতেই যাতে ফেডারেশন অব ইনডাস্ট্রি অ্যান্ড কমার্স অব নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন—FINER-এর একজন করে সদস্য থাকেন, তারও সুপারিশ করেছেন তিনি। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগমের পুনর্গঠন করে FINER-কে এর সদস্যপদ দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছেন মন্ত্রী।

অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম (২০০২ সালে অন্তর্ভুক্ত) এবং ত্রিপুরা—উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই আটটি রাজ্যের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে, এখানে শিক্ষার প্রসারের হার অবশিষ্ট ভারতের থেকে দ্রুততর, কৃষিনির্ভরতা কমিয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হচ্ছে রাজ্যগুলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সেভাবে সৃষ্টি হচ্ছে না। পরিকাঠামোগত ঘাটতি সহ আঞ্চলিক উন্নয়নের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৪ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক গঠন করেছে। ২০১৫-১৬ সালে এই মন্ত্রকের জন্য অর্থ-বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৩৬২ কোটি টাকা।

এই অঞ্চল কতকগুলি অসামান্য সুবিধা ভোগ করে। অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য পূর্ব ভারতের বিশাল দেশীয় বাজার, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার এই এলাকা। উর্বর কৃষিজমি ও বিপুল মানবসম্পদে বলিয়ান সম্পদ-সমৃদ্ধ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, ভারতের সব থেকে উন্নয়নশীল এলাকাগুলির অন্যতম হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রাখে।

অর্থনৈতিক এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে জনগোষ্ঠীগত সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাজারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দক্ষতা উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে। তবে অপ্রতুল পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীনতা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি প্রভৃতি নিয়ে এর সমস্যাগুলি এতটাই অন্য রকম যে প্রথাগত বাজারভিত্তিক সমাধান এক্ষেত্রে খাটবে না।

ভারতে তরুণ শ্রমশক্তির প্রাচুর্য থাকলেও দক্ষতার মান এক বড় চ্যালেঞ্জ। ২০১৪ সালের এক সমীক্ষায় ৭৮ শতাংশ কর্মদাতা বলেছিলেন, ভারতে যেভাবে দক্ষতার চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ফারাক বাড়ছে, তাতে তাঁরা চিন্তিত। ৫৭ শতাংশ কর্মদাতা জানান, এই মুহূর্তে প্রয়োজন থাকলেও দক্ষ প্রার্থীর অভাবে তাঁরা শূন্য পদ পূরণ করতে পারছেন না। প্রতি বছর যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ শ্রমশক্তিতে সংযোজিত হন, তাঁদের মধ্যে খুব বেশি হলে ২০ লক্ষের প্রথাগত প্রশিক্ষণ আছে। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি ১০০ জনের মধ্যে মাত্র সাড়ে চার জন শ্রমিক দক্ষ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্য বলছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই হার আরও কম। অথচ অন্যদিকে কোরিয়ায় শ্রমশক্তির ৯৬ শতাংশ এবং জাপানের ৮০ শতাংশ কর্মী দক্ষ।

দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যকর মডেলের অভাব ভারতের এক বড় প্রতিবন্ধকতা। বিভিন্ন সংস্থা নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম চালালেও এদের অধিকাংশের মধ্যেই উদ্ভাবনী শক্তির অভাব চোখে পড়ে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দক্ষতা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুব সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সেখানে অবিলম্বে একটি 'দক্ষতা উন্নয়ন বিশ্ববিদ্যালয়' গড়ে তোলা দরকার। বৃহৎ 'হাব'-গুলিতে 'অভিবাসন সহায়তা কেন্দ্র' স্থাপন করে এর মাধ্যমে কর্মপ্রার্থীদের এই অঞ্চলেই জীবিকা অর্জনের সুব্যবস্থা করা সম্ভব। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকা এবং বাম উগ্রপন্থা অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকর হবে।

একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ২০১১ থেকে ২০২১ সাল—এই এক দশকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাত্র ২৬ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর অর্ধেকই, প্রায় ১২,৩৪,৩৫৭টি

কর্মসংস্থান হবে আসামে। অথচ এই এক দশকে এই অঞ্চলে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হবে ১ কোটি ৭০ লক্ষ, অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় মানবসম্পদের জোগান ১ কোটি ৪০ লক্ষ বেশি। সুতরাং স্থানীয় চাহিদার পাশাপাশি যারা এই অঞ্চলের বাইরে কাজ খুঁজতে যাবে, তাদেরও যথাযথ দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

আরেকটা বড় চ্যালেঞ্জ হল দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিকে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকার যুব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া, তাদের এ সম্পর্কে জানিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, কর্পোরেট ক্ষেত্রের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির একমাত্র পথ হল উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর তার আধুনিকীকরণ সুনিশ্চিত করা।

আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রায়শই বলি, যেসব মহিলা পূর্ণসময়ের প্রথাগত শিক্ষা পাচ্ছেন না, সরকারের উচিত তাঁদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা। চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণপত্রের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত দক্ষতাকে। আজ যখন সরকার 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' এবং 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'-র মতো প্রকল্প প্রণয়ন করেছে, তখন যুবসমাজ, বিশেষত মহিলাদের কম্পিউটার শিক্ষা ও দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা দরকার। ভিন্নভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও সরকারকে তৎপর হতে হবে। এ জন্য শিল্পগোষ্ঠী ও নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা প্রয়োজন। সরকার এই উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীর বৃহৎ অংশকে এক ছাতার তলায় আনতে পারলে তাদের ক্ষমতায়ন ও জীবনধারায় রূপান্তর সাধনের লক্ষ্য অনেকটাই অর্জন করা সম্ভব হবে।

সেতুবন্ধন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য অবিলম্বে বহুমুখী দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। একইসঙ্গে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে শিক্ষানবিশিকে সংযুক্ত করা উচিত। হাতেকলমে শিক্ষা, জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থীদের এগিয়ে দেবে। এছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয়, প্রাসঙ্গিক এবং চাহিদা উপযোগী হতে হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দক্ষতা উন্নয়ন প্রয়াসকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা দরকার। এখানকার বাসিন্দাদের মানসিকতা প্রবলভাবে কৃষিভিত্তিক। চাহিদা নির্ভর দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এখানকার ক্রমবর্ধমান যুব সম্প্রদায় এই অঞ্চলের এক বড় সম্পদ। এখানকার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সুফল পেতে হলে জনগোষ্ঠীগত সুবিধাকে কাজে লাগাতে হবে, বিকাশ ঘটাতে হবে বাজার ও দক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী মাপকাঠিগুলির।

স্থানীয় প্রতিভা যাতে কাজের খোঁজে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছেড়ে বাইরে যেতে বাধ্য না হয় তা সুনিশ্চিত করতে এখানে কর্মসংস্থান ও দক্ষতাবৃদ্ধির একটি দিশানির্দেশ প্রণয়ন করা দরকার। বেশ কিছু ক্ষেত্র এই অঞ্চলে কর্মসংস্থানের উৎস হিসাবে দেখা দিচ্ছে। কোন ধরনের শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পেলে এখানকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুবিধা হবে, তা অবিলম্বে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নানা ধরনের ফল ও শস্য জন্মায়। এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে মনোযোগী হলে তা কর্মসংস্থানের এক বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে। আর একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হল হস্তচালিত তাঁত। এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি দেশজুড়ে রয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগে এই ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়াস চালালে তা স্থানীয় প্রতিভা ও ঐতিহ্য—দুইয়ের সংরক্ষণেই সমর্থ হবে।

স্টার্ট আপ কোম্পানি এবং নতুন উদ্যোগগুলিকে সহায়তা ও উৎসাহদানের প্রয়াস উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়িক পরিবেশে ইতিমধ্যেই একটা ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। সঠিক দক্ষতা ও মূলধনের জোগান, নেটওয়ার্কিং ও বিনিময়, উদ্যোগ সহায়ক সংস্কৃতি এবং শক্তিশালী বিপণন কৌশলের মাধ্যমে স্টার্ট আপের উপযোগী বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে।

হোটেল ও আতিথেয়তা ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা ও চিকিৎসা সহায়ক শিল্প, কৃষি-ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, ITeS, BPO, KPO, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, গাড়িশিল্প, নির্মাণ, বৈদ্যুতিন শিল্প, বস্ত্রবয়ন, অলংকার শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই অঞ্চলের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

বড় মাপের বিনিয়োগ এই অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। এর পাশাপাশি ছোট মাপের ঋণদান, জীবিকা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সুস্থিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলির ক্ষমতায়নে জোর দেওয়া দরকার। এই কাজে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলিকে একযোগে উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও অংশীদারিত্বের বিকাশের মধ্য দিয়ে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে।❑

[লেখক Centum Learning-এর CEO এবং MD। তিন দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতায় দেশের প্রথম সারির আরও বেশ কিছু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান স্কুল অব বিজনেস, হায়দরাবাদের অতিথি অধ্যাপক। সম্প্রতি দক্ষতা উন্নয়ন নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।]

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ (NEC) এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (DoNER) ভিশন ২০২০-র লক্ষ্য

- ✶ ২০০৭-০৯ এবং ২০১৯-২০ সালের মধ্যে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে সার্বিক রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GSDP-র বিকাশহার ১১.৬৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়া।
- ✶ ২০০৭-০৯ এবং ২০১৯-২০ সালের মধ্যে সার্বিক মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ১২.৯৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া।
- ✶ এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার জন্য মন্ত্রকের তরফে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল—
- ✶ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়ানো।
- ✶ এ জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
- ✶ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করা।
- ✶ মন্ত্রকের সহায়তায় আরও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
- ✶ বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির ক্ষমতা বাড়ানো।
- ✶ দক্ষতা উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ।

২০১৬-১৭ সালের সাধারণ বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চল

জৈব খাদ্যশৃঙ্খল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব

২০১৬-১৭ সালের সাধারণ বাজেটে DoNER (উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রক) মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২,৪০০ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরে এই মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৩৩৪.৫০ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েই এ বছর বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জৈব খাদ্যশৃঙ্খল গঠনের ওপর। এই অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল জৈব খাদ্যশৃঙ্খল গঠনসংক্রান্ত (অর্গানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্ট) প্রকল্পের ঘোষণা। এই খাতে বরাদ্দ রয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। এই প্রকল্প সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পালাবদল ঘটাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্প একদিকে যেমন এই অঞ্চলে জৈব শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে, তেমনি দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকেও জৈব চাষকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন সংস্থা (স্টার্ট আপ) শুরু করার জন্য শিল্পোদ্যোগীদের এই অঞ্চলে পাড়ি জমাতে উৎসাহ দেবে। জৈব চাষের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়ে নিয়েছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সিকিমকে দেশের মধ্যে জৈব চাষে প্রথম সফল রাজ্য (অর্গানিক স্টেট) হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

৫৬টি মন্ত্রকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ৩৩০৯৭.০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের ২৯০৮৭.৯৩ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ১৪ শতাংশ বেশি। অ-তামাদি কেন্দ্রীয় সহায়সম্পদ সঞ্চয় তহবিলে (NLCPR) বাজেট বরাদ্দ ৯০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করা হয়েছে ২০১৬-১৭ সালে। এ বছর উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের প্রকল্পগুলির জন্য বাজেট বরাদ্দ ৭০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৯৫ কোটি টাকা।

সদ্য চালু হওয়া উত্তর-পূর্বের সড়ক ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ১৫০ কোটি টাকা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আন্তঃরাজ্য সড়কপথ নির্মাণে এই প্রকল্প অত্যন্ত সহায়ক হবে। এর পাশাপাশি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সড়কপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে আর্থিক সহায়তা দেবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন বিত্ত নিগম-এর (NEDFC) জন্য বাজেট বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৫ কোটি টাকা এবং এর ফলে এই অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রীর 'স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া' কর্মসূচি আরও জোরদার হবে। অনুরূপভাবে, দক্ষতা বৃদ্ধি খাতে বাজেট বরাদ্দ ১৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬ কোটি টাকা হওয়ার ফলে 'স্টার্ট আপ' প্রকল্পগুলি আরও উৎসাহ পাবে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ৩ বছরের করছুটি এবং ৩ মাসের 'এগজিট পিরিয়ড'-এর সুবিধা ছাড়াও নতুন শিল্পোদ্যোগীদের আর্থিক বোঝা কিছুটা লাঘব করতে DoNER-মন্ত্রক 'নতুন শিল্পোদ্যোগ তহবিল' (ভেঞ্চার ফান্ড) দিয়ে তাদের সাহায্য করবে। এই সব ব্যবস্থাপনা ছাড়াও, উত্তর-পূর্বের গ্রামাঞ্চলে জীবিকার সংস্থানের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই খাতে এ বছরে বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দেশের অন্যান্য অংশের কাছে এই অঞ্চলের বিশেষ দিকগুলিকে তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। এই কাজে বাজেট বরাদ্দ ১০.৫০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এ বছরে করা হয়েছে ১৭ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ৬০ শতাংশ বেশি। এ বছরের ১২-১৪ ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লিতে 'গন্তব্য উত্তর-পূর্ব' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল DoNER-মন্ত্রক। উত্তর-পূর্ব ভারতের যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষত হস্তশিল্পে বা হস্তচালিত বয়নশিল্পে সেগুলিকে বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে এই ধরনের আরও অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চায় এই মন্ত্রক। ২০১৬-১৭ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে মুম্বই ও বেঙ্গালুরু-তে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

'অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি'-র অঙ্গ হিসাবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আর্থিক সহায়তা দেওয়াও DoNER-মন্ত্রকের প্রধান লক্ষ্য। এই কাজে ভারতের পক্ষ থেকে বাজেট বরাদ্দের ৫৮৭ কোটি টাকা তুলে দেবে DoNER-মন্ত্রক।

দেশজুড়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে যে ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে ১৬২৩ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য। এছাড়াও বোড়োল্যান্ড উপজাতি পরিষদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করে রাখবে সরকার।❑

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল—কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ অ-তামাদি কেন্দ্রীয় সহায়সম্পদ তহবিল (NLCPR)

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পরিকাঠামোর অভাব পূরণ করতেই NLCPR তহবিলের অর্থ কাজে লাগানো হয়। রাজ্যগুলির তরফে জমা দেওয়া অগ্রাধিকারমূলক তালিকার ভিত্তিতে এই তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হয়। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত NLCPR-এর আওতায় ১৪৩০৯.২৩ কোটি টাকার প্রায় ১৫৬৯টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫৮৪৬.২০ কোটি টাকার ৮৯০টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ৮৪৬৩.০১ কোটি টাকার ৬৭৯টি প্রকল্পের কাজ প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে। এর পাশাপাশি, গত তিন বছরে ৩৮৬৭.৯০ কোটি টাকার মোট ২৪৭টি প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে (২০১৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) চালু প্রকল্পগুলির কাজ সম্পন্ন করার জন্য ৩৭৬.৬১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ১৭টি নতুন প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই নতুন প্রকল্পগুলির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে ১২০.৯৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/দপ্তরগুলিকে তাদের মোট বাজেট সহায়তার অন্ততপক্ষে ১০ শতাংশ অর্থ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হয়। এই অঞ্চলে পরিকাঠামোর অভাব পূরণ করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (DoNER) এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

NLCPR-এর আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলিকে পরিচালনা করে থাকে DoNER মন্ত্রক। NLCPR-এর আওতায় এ পর্যন্ত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ৬৩৩১৩.৩৬ লক্ষ টাকার মোট ৫৩টি প্রকল্প এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ১৪৫৪১৬.৫৫ লক্ষ টাকার মোট ১৬৮টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের আওতায় নানান প্রকল্পের রূপায়ণ ঘটাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে ১৭৩২২.১২ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে ৪১টি প্রকল্প, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ৪০৮৭০.৮৫ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে ৫৮টি প্রকল্প এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ২৪২৯৪.৯৮ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে ৭৮টি প্রকল্পের রূপায়ণ ঘটাচ্ছে NEC।

সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচির (BADP) আওতায় সীমান্তবর্তী এলাকায় উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই কর্মসূচির আওতায় আন্তর্জাতিক সীমানার লাগোয়া অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী মানুষের উন্নয়নের বিশেষ চাহিদাগুলি পূরণে চলতি আর্থিক বছরে এই কর্মসূচির আওতায় ২৭৭৫৭.৮৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান (RMSA)-এর আওতায় ৬৩০টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদনের পাশাপাশি শিক্ষার গুণমানের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য ৩৩৩৪টি বিদ্যালয় নির্বাচন করেছে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতাধীন বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা দপ্তর। এই কর্মযজ্ঞের সূচনা থেকে এ পর্যন্ত ১২২৮৮৪.৩৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পরিকাঠামোগত সমস্যার পর্যালোচনা

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ (NEC) বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও পরিকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলির পর্যালোচনা করে থাকে। NEC-এর প্রধান প্রধান পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহণ পরিকল্পনা যার ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ ত্বরান্বিত সড়ক উন্নয়ন কর্মসূচি' (SARDP-NE); রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বাত্মক বিদ্যুৎ সংবহন ও বিতরণের সংক্রান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যার ভিত্তিতে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির জন্য বিদ্যুৎ সংবহন ও বিতরণে সর্বাত্মক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে; এছাড়াও রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য 'ভিশন-২০২০' নথি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য সর্বাত্মক পর্যটন মহা-পরিকল্পনা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মীদের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আকাশপথে যোগাযোগবিষয়ক সমীক্ষা ইত্যাদি।

জন্মলগ্ন থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সড়ক, সেতু, বাস ও ট্রাক টার্মিনাস, বিমান বন্দর, আকাশপথে যোগাযোগ; বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সংবহন, সেচ ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, জনসাধারণের ব্যবহার্য পরিকাঠামো ও ক্রীড়া; চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য; কৃষি ও আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড, শিল্প, পর্যটন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; জীবিকা সংস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১২৭৫৬ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে আন্তঃরাজ্য প্রকৃতির এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ১০৯৪৯ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ, তথা ১১টি আন্তঃরাজ্য বাস টার্মিনাস ও ৩টি আন্তঃরাজ্য ট্রাক টার্মিনাস নির্মাণ। ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গুয়াহাটি, শিলচর, জোড়হাট, ডিব্রুগড়, লীলাবাড়ি, তেজপুর, উমরই, লেঙপুই, ডিমাপুর, ইম্ফল, আগরতলা ও তেজু—এই ১২টি বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল তার প্রকল্প ব্যয়ের ৬০ শতাংশ প্রদান করেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ।❑

উত্তর-পূর্বাঞ্চল : আদিবাসী জনসংখ্যার সার্বিক বিকাশ কোন পথে?

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল গড়ে উঠেছে ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং সিকিম—এই আটটি রাজ্যের সমাহারে। রাজ্যগুলির জনসংখ্যার একটা ব্যাপক অংশ জনজাতি/আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। কোনও কোনও রাজ্যে সংখ্যাটা ৪০ শতাংশেরও বেশি, অর্থাৎ তারাই সংখ্যাগুরু, কাজেই রাজনৈতিক ক্ষমতা/প্রতিপত্তিও তাদের হস্তগত। কিন্তু সার্বিক অর্থে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনজাতি মানুষজনের উন্নয়ন আদপেই ঘটেনি। অর্থনৈতিক সুফল কুক্ষিগত করে রেখেছে কতিপয় 'এলিট' জনজাতির মানুষ, তাই তাদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে উৎকট এক শ্রেণিবৈষম্য। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে দেশের বাকি অংশের তুলনায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মাপকাঠিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পিছিয়ে রয়েছে কয়েক যোজন। অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে জনজাতি ও অ-আদিবাসী জনসংখ্যার মধ্যে জনতত্ত্বগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে হতে প্রায়শই তা জাতিদাঙ্গার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ফলত বিঘ্নিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এদিকে, দীর্ঘ ছয় দশকের আগে বিধিবদ্ধ ষষ্ঠ তপশিলও, সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে সম্ভব উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশ? কীভাবেই বা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনজাতির মানুষজন তাদের পরম্পরা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য তথা নিজস্বতা বাঁচিয়ে রেখে সার্বিক উন্নয়নের সুফল পেতে পারেন তথা সেই কর্মযজ্ঞে শামিল হতে পারেন? সংশ্লিষ্ট নিবন্ধে সেই পথের সন্ধান করেছেন—**নরেশ সি সাক্সেনা।**

দেশের মোট আদিবাসী জনসংখ্যার মাত্র ১২ শতাংশের বাস উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যে। কিন্তু মূল ভূখণ্ডের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে আদিবাসী জনসংখ্যা হল সংখ্যালঘু। পক্ষান্তরে, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ডের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। ফলত, সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে তারা রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী। তবে বিগত কয়েক দশকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি এবং বাংলাদেশ থেকে অবিরাম অর্থনৈতিক অভিবাসনের স্রোত দেখা যাচ্ছে। ফলস্বরূপ, দেশীয় (আদিবাসী) জনসংখ্যার প্রতিকূলে জনতত্ত্বগত (demographic) ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার ছবিটা ক্রমাগত প্রকট হচ্ছে। উদাহরণ পেশ করা যাক। ১৯৫১ সাল নাগাদ ত্রিপুরা রাজ্যটিতে আদিবাসী জনসংখ্যা যেখানে ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ; ২০০১ সালে তা গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৩০ শতাংশে। অরুণাচল প্রদেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ১৯৯১ সালে কমে দাঁড়ায় ৬৪ শতাংশেরও নীচে, অথচ ১৯৫১ সালে সে রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই ছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। উদাহরণ আরও রয়েছে। আসামের সমতল অঞ্চলের একটি জনজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায় হল বোড়ো। বোড়ো স্বশাসিত পরিষদ (Bodo Autonomous Council)-এর অধীন বেশ কয়েকটি জেলায় জনসংখ্যার নিরিখে বর্তমানে এরা সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের জমি জায়গা হাতছাড়া হয়েছে, মূলত অভিবাসী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে। ফলত, প্রায়শই ব্যাপক আকারে হিংসার ঘটনা ঘটছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।

এই জনসংখ্যাগত বিভেদের/ বিভাজনের ফল হিসাবে আদিবাসী জনজাতি এবং অ-আদিবাসী জনসংখ্যার (আসামের ক্ষেত্রে অসমিয়া, মণিপুরে মেইতি এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বাঙালি) মধ্যে অসম ক্ষমতা ভিত্তিক সম্পর্কের জন্ম হচ্ছে। কারণ, এই শেষোক্ত গোষ্ঠী অর্থাৎ, অ-আদিবাসী জনসংখ্যার হাতেই কিন্তু রয়েছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা তথা প্রতিপত্তি। এমনকী জনজাতিগুলির মধ্যেও অসংখ্য গোষ্ঠীগত ভাগাভাগি। গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২২০টিরও বেশি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব আদিবাসী ভাষায় কথাবার্তা বলে এবং প্রত্যেক গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা নিজস্ব সংস্কৃতি এবং জনজাতির ঐতিহ্য রয়েছে। সংস্কৃতিগত দিক থেকে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই ভেদাভেদ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায়শই আন্তঃআদিবাসী সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলত, বিঘ্নিত হয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শান্তি ও বিকাশ।

ষষ্ঠ তপশিল

ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিল বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ১৯৬০-এর দশকে বৃহত্তর অবিভক্ত আসামে যে সমস্ত জনজাতি সংখ্যালঘু ছিল, তারা যাতে নিজেদের উন্নয়নের মডেল কী

হবে তা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারেন তথা যে সমস্ত প্রথানুযায়ী আচার-আচরণ ও ঐতিহ্যের কারণে তারা অদ্বিতীয় ও অনন্য হিসাবে স্বীকৃত, সেগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য রক্ষাকবচ পেতে পারেন, সে জন্যই এই ষষ্ঠ তপশিলের বিধিবদ্ধকরণ। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং মেঘালয়ের মতো জনজাতি সংখ্যাগুরু রাজ্য গঠন হওয়ার পরে ষষ্ঠ তপশিলের পরিপ্রেক্ষিত পালটে যায়। নাগাল্যান্ড পৃথক রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পরই নাগার ষষ্ঠ তপশিল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মিজোরাম রাজ্যটির মধ্যে যে সমস্ত সংখ্যালঘু জনজাতির বাস কেবলমাত্র তাদের জন্যই মিজোরা ষষ্ঠ তপশিলের আবেদন জানায়। এদিকে মেঘালয়ের ক্ষেত্রে স্বশাসিত জেলা পরিষদ (Autonomous District Councils—ADCs) থেকে যায়। ADCs হল আরেকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অনেকটা অধীনস্থ বিধানমণ্ডল (sub-ordinate legislature)-এর মতো। মেঘালয় যখন বৃহত্তর অবিভক্ত আসামের অংশ ছিল তখন এই পরিষদের প্রাসঙ্গিকতা ছিল। যাতে করে জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে নিজস্ব আইন-কানুনের ধ্যানধারণা বজায় থাকে এবং চতুর্দিকে বৃহত্তর অ-আদিবাসী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর চাপে হারিয়ে না যায়। কিন্তু বর্তমানে মেঘালয় একটি পৃথক রাজ্য। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশই জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজ্যে (রাজনৈতিক) ক্ষমতার কাঠামোয় তাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব। এই পরিস্থিতিতে ADC-গুলি থেকে যাওয়ায় কেবল অনিশ্চয়তা এবং ধন্ধের সৃষ্টি হচ্ছে।

আরেকটি সমস্যা হল, ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত এলাকাগুলিতে পরিষদের নীচের স্তরে আর কোনও নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান নেই। তৃণমূল স্তরে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতির কারণে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার বিকাশে প্রতিকূল প্রভাব পড়ে চলেছে। স্বশাসিত পরিষদের নীচে গ্রাম স্তরে ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের দেখা মেলে। কিন্তু সেগুলি গণতান্ত্রিক প্রকৃতির নয়—গোষ্ঠীভিত্তিক। এর প্রতিনিধিত্ব করেন মুখিয়া (headman)। যেমন মেঘালয়ে খাসিদের পুরুষানুক্রমিক প্রধান, সাইয়েম (Syien)। দেশের অন্যান্য রাজ্যে যেমন গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে এখানেও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৃণমূল স্তরে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের প্রচলন করা দরকার। যাই হোক, এ ব্যাপারে সর্ব স্তরে ঐকমত্য গড়ে ওঠা এখনও বাকি আছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন জীবনযাপন এবং জীবিকা নির্বাহ করে থাকে মূলত পাহাড় এবং বনাঞ্চলের মাধ্যমে। কৃষিকাজের পাশাপাশি তারা নির্ভর করে বয়ন এবং পশম পাওয়া যায় এমন পশু পালনের ওপর। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দা অধিকাংশ জনজাতি স্থানান্তরী চাষাবাদ (shifting cultivation) করে থাকে। এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় প্রথাগত বিধিবিধান, প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা। যাই হোক, দশকের পর দশক ধরে একটু একটু করে বাজারি অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলস্বরূপ এরা স্থানান্তরী চাষের বদলে স্থায়ী কৃষিকাজে সুস্থিত হয়েছে। ফলত কৃষিজ উৎপাদনের উপর ধীরে ধীরে গোষ্ঠী মালিকানার রদবদল ঘটে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা ক্রমে জন্ম দিয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের। বহিরাগতদের হাত থেকে স্থানীয়দের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য আইনের বিধান আছে বটে; কিন্তু তা স্থানীয়দের মধ্যেই ক্রমবর্ধমান শ্রেণিবৈষম্য ঠেকাতে পারছে না। বর্তমানে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কতিপয় আছেন ক্রোড়পতি। বিপরীতে, অধিকাংশ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরই কিন্তু কৃষিকাজের জন্য এমনকী এক একরও জমি হাতে নেই। লক্ষণীয়, এই সব নব্য ধনী জনজাতি এলিটরা জনজাতিদের স্বদেশীয় অধিকার রক্ষার দাবিতে সরব ঠিকই, কিন্তু তা আদপেই গোষ্ঠীর মধ্যে দরিদ্রতমদের কল্যাণের জন্য নয়। বরং লক্ষ্যটা মূলত নিজেদের স্বার্থরক্ষা তথা শোষিত গরিব স্বজাতিদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। গোষ্ঠী মালিকানাধীন জমি-জায়গার চরিত্র বদল হচ্ছে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূখণ্ডে। বাণিজ্যিক, উদ্যানজাত এবং অন্যান্য শস্য চাষের ক্রমাগত প্রসারের ফলস্বরূপই এমনটা ঘটছে। এর দ্বিতীয় কারণটি হল শহরের নিকটবর্তী তথা হাইওয়ে/জাতীয় সড়ক পার্শ্ববর্তী জমিজায়গার দরদাম ক্রমাগত বেড়ে চলা। এদিকে, এই সব এলিট জনজাতি কতিপয় মানুষদের মধ্যে শিল্প গড়ে তোলার মতো উদ্যোগিক দক্ষতা একেবারেই নেই এবং বিনিয়োগ হচ্ছে মূলত আবাসন ক্ষেত্রে।

মহিলাদের ওপর প্রতিকূল প্রভাব

বেসরকারিকরণের সূত্রে মহিলাদের ওপর ক্রমাগত আঘাত নেমে আসছে। উদাহরণ পেশ করা যাক। নানা জনজাতির প্রথাগত আইনে মহিলাদের জমিজায়গা, সম্পত্তি তথা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনও অধিকার নেই। এরকমও দেখা গেছে, নানা জনজাতির কোনও মহিলা যদি জমি-জায়গার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকেন, তবে সমাজ তাকে ডাইনি বলে চিহ্নিত করে এবং তিনি গোষ্ঠীর ক্ষতি করছেন বলে দায়ী করা হয়। তাদের ওপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। তাদেরকে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে, এমনকী জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, এমনও বাস্তবে ঘটেছে। ডাইনি হিসাবে দেগে দিয়ে হত্যার ঘটনার খবর এসেছে মূলত গোয়ালপাড়া, বঙ্গাইগাঁও, কোকড়াঝাড়, নলবাড়ি এবং ধুবড়ির মতো জেলাগুলি থেকে। জনজাতিগোষ্ঠীর ক্ষমতাশালী সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা, সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং কুসংস্কারের বাড়বাড়ন্ত মহিলাদের ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে হত্যার জন্য দায়ী কারণগুলির মধ্যে অন্যতম।

জমির পরচা না থাকা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড, অরুণাচল-প্রদেশ, মিজোরাম ও মেঘালয়— এই রাজ্যগুলিতে তথা মণিপুরের পাহাড়ি এলাকায় এবং আসামের কিছু জনজাতি অধ্যুষিত ভূখণ্ডে জমির কোনও লিখিত পরচা ব্যবস্থার চলন নেই। এমনকী সেখানে ভূমি রাজস্বও সরকারকে দিতে হয় না। জমির পরচা না থাকার দরুন একদিকে যেমন ক্রমবর্ধমান প্রজাস্বত্ব (tenancy) ও ভূমিহীনতার দরুন দরিদ্রদের মধ্যস্বত্ব (tenure)-এর ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বাড়ছে; পাশাপাশি কতিপয় মানুষের হাতে জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত

হওয়ার প্রবণতাও বাড়ছে। আর কমে চলেছে স্থানান্তরী চাষাবাদের ক্ষেত্রে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ। এই অঞ্চলে যে কাঠামোগত শর্ত মেনে জমিতে চাষাবাদ হয়ে থাকে তা হল, যে কোনও জমিতে যে কেউ চাষ করতে পারবেন ('free for all')। আর একটি বাস্তব তথ্য হল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কতিপয় 'এলিট' জনজাতি মানুষই বরাদ্দকৃত অধিকাংশ পরিমাণ সরকারি তহবিল কুক্ষিগত করতে সক্ষম। এই দুইয়ের যোগে প্রকট দারিদ্র এবং বৈষম্য বৃদ্ধির ঘটনা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে শিকড় গেড়ে বসছে। তবে সর্বসাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কতিপয় 'এলিট' জমির মালিকানার যে বেসরকারিকরণ ঘটিয়ে চলেছে তাকে কোনও মতেই সদর্থক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা যেতে পারে না। কারণ, কৃষিবিষয়ক (agrarian) পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর এর প্রভাব একান্তই রক্ষণশীল। সংযোগশীল সামাজিক সম্পর্কগুলি তার ফলে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে সহাবস্থান করতে থাকে।

তহবিল ব্যয়ের সীমিত সামর্থ্য

স্বশাসিত জেলা পরিষদ (ADC)-গুলির সাংবিধানিক মর্যাদা রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য কিছুটা পরিমাণ স্বাধীনতাও রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও পর্যাপ্ত তহবিলের বরাদ্দ করে পরিষদগুলিকে সমর্থভাবে গড়ে তোলা হয়নি। ফলত, বরাদ্দকৃত বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে পরিষদগুলির অবস্থা দাঁড়িয়েছে 'ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার'-এর মতো। শেষাবধি যা অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে সচেষ্ট হয়েছে। বিশেষ প্যাকেজের আওতায় পরিষদগুলিকে তদর্থক (ad hoc) অনুদান দেওয়া হচ্ছে। অথবা রাজ্যগুলির পরিকল্পনা বরাদ্দে (plan allocations) তহবিল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক, পরিষদগুলির তথা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিরও তহবিল ব্যয়ের সীমিত সামর্থ্যের দরুন (সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে) সামগ্রিক খরচের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকরই থেকে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে এখানে একটি তথ্য পেশ করা যাক। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দের অন্তত ১০ শতাংশ নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিকাশখাতে। এবং এক্ষেত্রে খরচ না হওয়া উদ্বৃত্ত অ-তামাদি অর্থভাণ্ডারে জমা পড়ে। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায়, এই অর্থভাণ্ডারে যে পরিমাণ তহবিল জমা রয়েছে এবং যে পরিমাণ অর্থ এই ভাণ্ডার থেকে খরচ হচ্ছে—দুইয়ের তুলনাটি একেবারেই সন্তোষজনক নয়। খরচের পরিমাণ এতটাই নগণ্য। আদতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি প্রশাসনিক মন্ত্রকের কাছে যথাযথ প্রস্তাব ও কর্ম-পরিকল্পনাই পাঠাতে পারছে না। অথবা ঠিকঠাক খরচ করতে অপারগ। এর নিট ফল দাঁড়াচ্ছে অত্যন্ত হতাশাজনক।

একই সঙ্গে, যখন বৈদেশিক বিনিয়োগের দ্বারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে কোনও প্রকল্প নির্মাণ হচ্ছে, জমি অধিগ্রহণ, পরিবেশগত ছাড়পত্র ইত্যাদির মতো বিবিধ আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করতে গিয়ে দীর্ঘসূত্রিকার প্যাঁচে পড়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে প্রকল্পের কাজ। ফলত, এই সব প্রকল্পে সামগ্রিকভাবে খরচের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। সদ্ব্যবহার (utilisation) শংসাপত্র, প্রকল্পের বিশদ বিবরণ/কর্ম-পরিকল্পনা ইত্যাদি দাখিল না করা, রাজ্যস্তরীয় অনুমোদন কমিটির বৈঠক করতে দেরি ইত্যাদি স্বল্প পরিমাণ অর্থ তহবিল ব্যয়-এর অন্যতম সাধারণ কিছু কারণ। বরাদ্দকৃত তহবিলের যথাযথ সদ্ব্যবহারের জন্য তা কেবল সময়মতো ক্ষেত্রীয় আধিকারিকদের হাতে তুলে দিলেই হবে না; একই সঙ্গে বিভিন্ন দিকে আরও বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণের দরকার। বিভিন্ন পদের অনুমোদন দিতে হবে (প্রকল্পে ব্যবহৃত) কাঁচামালের সংগ্রহ এবং পরিবহণের দিকেও নজর দিতে হবে। সেজন্য (কাঁচামালের) সংগ্রহ ও দরপত্রবিষয়ক প্রক্রিয়াদি যথাযথ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। মণিপুর এবং মেঘালয়ের মতো রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে 'জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন' (NREGA) তহবিল থেকে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর। এর অন্যতম মুখ্য কারণ হল দুর্বল নেটওয়ার্কের দরুন জেলা স্তরে অনলাইনে তথ্য (data) দাখিল করা দুষ্কর।

পরিকল্পনা দপ্তরকে সক্রিয় করে তুলতে হবে

এ ধরনের বিলম্ব এড়িয়ে তৎপরতার সঙ্গে কার্যকর্ম সম্পন্ন করাটা আদৌ কঠিন নয়। তবে সেজন্য রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের পরিকল্পনা দপ্তরকে শক্তিশালী/সমর্থ করে তুলতে হবে। কিন্তু বাস্তব সত্যিটা হল, রাজ্যের পরিকল্পনা দপ্তরগুলির বৈদেশিক অনুদান (external aid) পাওয়ার জন্য যথাযথ উৎকর্ষযুক্ত প্রস্তাব তৈরি করার সামর্থ্যই নেই। এমনকী ভারত সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি তহবিল পাওয়ার ক্ষেত্রেও ছবিটা একই। ফলত, এভাবে বৈদেশিক তথা কেন্দ্রীয় সহায়তা দুইই হাতছাড়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির।

রাজ্যগুলিতে যদি কর্মসংস্কৃতিসম্পন্ন সমর্থ পরিকল্পনা দপ্তর গঠন করা যায় তবে এই ছবিটা বদলাতে না পারার কোনও কারণ নেই। এ ধরনের পরিকল্পনা দপ্তর রাজ্যের পক্ষে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ কৌশল এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে কাজ করবে। অবশ্যই সেখানে মাথায় রাখতে হবে জনজাতি সমাজের চাহিদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকটিও। দপ্তরগুলি রাজ্যের জন্য বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করবে, পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে নিয়মিত নজরদারি চালাবে এবং পর্যালোচনা করবে, তথা প্রকৃত বরাদ্দ এবং সম্পদ বণ্টনের নিরিখে পরিকল্পনা রূপায়ণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রদবদল ঘটাবে। এভাবেই পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলি চূড়ান্ত করা তথা তার থেকে সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া সম্ভবপর।

অন্যান্য দিক

মাথাপিছু স্বল্প আয়, বেসরকারি বিনিয়োগের অভাব, পুঁজি গঠন (capital formation)-এর ক্ষেত্রে স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা—শুধু জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাই নয়, সিকিম বাদে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরই এটাই বৈশিষ্ট্য। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের যোগাযোগ

ব্যবস্থা সর্বার্থেই অত্যন্ত দুর্বল। সড়ক যোগাযোগ, রেলপথের বিস্তার, বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রেই ছবিটা একই। বিদ্যুৎ ঘাটতি, একটা বড় সমস্যা এই অঞ্চলের। বিদ্যুতের জোগান বাড়াতে ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি এবং অন্যান্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিসম্পদের সদ্ব্যবহারের দিকে নজর দিতে হবে। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই নিজস্ব কর আদায়ের পরিমাণ তথা অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ এতটাই কম যে, রাজ্যগুলি একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় সহায়তা/ অনুদানের উপর নির্ভরশীল। স্থানীয় জনজাতিদের মধ্যে কতিপয় বিত্তশালী মানুষজন মূলত জমিজায়গা জাতীয় বিষয়সম্পত্তিতে বিনিয়োগেই আগ্রহী। ঝুঁকিপূর্ণ কোনও উদ্যোগে পয়সা ঢালতে একেবারেই চান না।

উপরন্তু, ভারত সরকারের তরফে যে বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে করা হয়, সামগ্রিকভাবে তার পরিমাণ অনেকটা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। তবে তার জন্য প্রশাসনিক এবং বিলিবণ্টন ক্ষেত্রে দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে। অত্যন্ত বেশি সংখ্যক গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' সরকারি কর্মচারী থাকার কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পরিকল্পনাবহির্ভূত খাতে খরচের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। এদিকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ তলানিতে। এই দুইয়ের যোগফলস্বরূপ, উদার হস্তে কেন্দ্রীয় সহায়তা/অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনা-খাতে খরচের ক্ষেত্রে টান পড়ছে। উদাহরণ দেওয়া যাক, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আসামে মাথাপিছু পরিকল্পনা ব্যয় যেখানে ছিল মাত্র ৫,৭৭৫ টাকা; সেখানে সমপরিমাণ দরিদ্র জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাজ্য ছত্তিশগড়ে এর পরিমাণ ছিল এর দ্বিগুণেরও বেশি, ১২,৮০৭ টাকা।

পাশাপাশি, রাজ্যগুলিকে যে কোনও (কর্ম-পরিকল্পনা) ক্ষেত্রে নজরদারি ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। যার অন্যতম প্রধান একটি শর্ত হল চূড়ান্ত ফলাফলের দায় সরকারি কর্মচারীদের নিতে হবে। কারণ, প্রায়শই দেখা যায়, নিজেদের ভুলভ্রান্তি ঢাকতে সরকারি কর্মীরা রং চড়িয়ে রিপোর্ট, পরিসংখ্যান ইত্যাদি পেশ করেন। যেমন— উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলির দাখিল করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মারাত্মক অপুষ্টির শিকার, এমন শিশুদের সংখ্যা ১ শতাংশের থেকেও অনেকটা কম। পক্ষান্তরে, ইউনিসেফ (UNICEF) এ ব্যাপারে ওই অঞ্চলে যে সমীক্ষা চালায় তাতে একেবারেই অন্য ছবি উঠে আসে। দেখা যায়, মণিপুরে এ ধরনের শিশুদের সংখ্যা ৩.৫ শতাংশ এবং মেঘালয় ও ত্রিপুরা—এই দুই রাজ্যে পরিমাণটা অত্যন্ত বেশি, প্রায় ১৬ শতাংশ। এই দুই প্রায় আসমান-জমিন ফারাকবিশিষ্ট পরিসংখ্যানের মধ্যে থেকে সঠিক সংখ্যাটি জরুরি ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। ক্ষেত্রীয় তথ্যাদি (field data) যাতে প্রামাণ্য, বিশ্বাসযোগ্য এবং পর্যালোচনার পর প্রাপ্ত তথ্যাদির (evaluated data) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তার জন্য সামগ্রিক পন্থার সংস্কারসাধন দরকার।

দেশের বাকি অংশের সঙ্গে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি অধ্যুষিত পকেটগুলির মধ্যে (অর্থনৈতিক) বৃদ্ধি হারের তফাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। পরবর্তী এক দশক বা তার কাছাকাছি সময়পর্বের মধ্যে এই ফারাকটা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস করতে তথা পুরোপুরি অবলুপ্ত করতে হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে শুধু অর্থনৈতিক সম্পদের প্রবাহ বাড়ালেই হবে না, বিলি এবং শাসন (delivery and governance)—এই দুটি ক্ষেত্রে ব্যাপক মানোন্নয়নের চেষ্টা চালাতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পদের লভ্যতার বিষয়ই নয় এটি। বরং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে লভ্য সম্পদের কার্যকরী/যথাযথ ব্যবহার না হওয়াটাই বৃদ্ধি ক্ষেত্রে ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে প্রমাণিত। আর এর জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট অঞ্চল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবিশেষের অক্ষমতা। তা কাটিয়ে উঠতে হলে রাজ্যসরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে সক্ষমভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে। একই সঙ্গে নাগরিক সমাজ (civil society) এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে যথাযথ সুফলদায়ী অংশীদারিত্বের প্রসার ঘটাতে হবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা বাড়ানো বিশেষভাবে জরুরি।❑

[লেখক যোজনা কমিশন, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক এবং সংখ্যালঘু কমিশনের প্রাক্তন সচিব।
email : naresh.saxena@gmail.com]

উত্তর-পূর্বের কৃষিকাজ

পরিবেশ-বান্ধব চাষাবাদের পদ্ধতি দেখিয়েছে সমৃদ্ধির দিশা

কৃষিই উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির অর্থনীতির বুনিয়াদ। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের অধিকাংশই রুজি-রুটির জন্য কৃষিকাজের ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির আশানুরূপ বিকাশ ঘটেনি। এমনকী ফলনের পরিমাণ ও উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বৈচিত্রের দিক থেকে বিচার করলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে। কৃষিকাজে এই অঞ্চলের অনন্ত সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সমস্যার বিভিন্ন কারণ ও তার সমাধানের পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন **নীরেন্দ্র দেব।**

'আই উইল শো ইউ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম আইদার ইয়োর শ্যাডো অ্যাট মর্নিং স্ট্যানডিং বিহাইন্ড ইউ; অর ইয়োর শ্যাডো অ্যাট ইভনিং—রাইজিং টু মিট ইউ'

কবিতার এই অসামান্য ছত্রগুলি অন্য এক প্রেক্ষিতে লিখেছিলেন টি এস এলিয়ট। কিন্তু উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঘুরে সেখানকার বাসিন্দাদের প্রথাগত চাষাবাদ ও কৃষিকাজের ওপর তাদের নির্ভরতার ছবিটা দেখলে কবিতার এই কথাগুলোরই অনুরণন শোনা যাবে মনে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি যে কতটা বদলে গেছে তারও বোধহয় ইঙ্গিত দেয় কবিতার এই কয়েকটা ছত্র।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কৃষিকাজ। দেশের প্রত্যন্ত এই অঞ্চল প্রায়শই প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের মধ্যে রয়েছে নানান হিংসাত্মক ঘটনা। এই অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদে আলোচনা করা গেলে এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণগুলি উঠে আসবে এবং সেইসঙ্গে তা সমাধানের পথও মিলবে। অরুণাচলপ্রদেশ, অসম, সিকিম, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা—উত্তর-পূর্বের এই আটটি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। রাজ্যগুলির বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রেও কৃষিই প্রধান ভরসা।

তবে এই অঞ্চলের মতো জাতি ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র দেশের অন্য কোনও অংশে চোখে পড়ে না। বর্তমানের সিকিম-সহ এই আটটি রাজ্যের একটা স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঘরানা রয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কৃষিকাজের আলাদা-আলাদা পদ্ধতি। একই দেশের মধ্যে এত ধরনের সভ্যতা-সংস্কৃতির বৈচিত্র দেখে আমরা নিজেরাই মাঝে মাঝে অবাক হই। তবে এই বৈচিত্রই বোধহয় ভারতের প্রধান শক্তি।

এই অঞ্চলের কৃষিকাজকে একই ছাঁদে ফেলে দেখাটা অত্যন্ত অনুচিত। জলের অভাব বা সেচের সুবিধার অভাবজনিত সমস্যা কাটিয়ে ব্যয়সাশ্রয়ীভাবে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সহায়সম্পদ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ কৃষি পদ্ধতি গড়ে তুলতে সক্ষম এখানকার প্রতিটি সম্প্রদায়।

জল সংরক্ষণ ও কৃষিকাজের ক্ষেত্রে প্রতিটি আদিবাসী বা জনজাতি সম্প্রদায়ের যেমন প্রথাগত কিছু পদ্ধতি রয়েছে, তেমনি সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু প্রথাগত জল সংরক্ষণ পদ্ধতির কথাও সুবিদিত। এই ধরনের প্রচলিত জল সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে রয়েছে অসমের 'ডংগস', মেঘালয়ের 'বাঁশের ড্রিপ সেচ' ব্যবস্থা, অরুণাচলপ্রদেশের জিরো উপত্যকার 'ভেজা ধান ও মৎস্যচাষ' ব্যবস্থা, নাগাল্যান্ডের ফেক জেলায় বসবাসকারী চাখেমাং নাগা উপজাতিদের 'জাবো' পদ্ধতি এবং মিজোরামের 'ছাদের ওপর বৃষ্টির জল সংরক্ষণ' পদ্ধতি। এছাড়াও সিকিমের জৈব চাষের সাফল্যের কথাও আজ সর্বজনবিদিত।

উত্তর-পূর্ব ভারতের কৃষিকাজের আরও একটা বৈশিষ্ট্যের কথাও প্রায় সকলের জানা, যাকে সাধারণভাবে বলা হয় ঝুম চাষ বা স্থানান্তর চাষ। চাষিরা চাষের একটা মরশুমে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের গাছপালা পুড়িয়ে দিয়ে সেই জমিতে চাষ করে থাকেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মোট কৃষিকাজের ৮৫ শতাংশই হয় স্থানান্তর বা ঝুম পদ্ধতিতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমির চাহিদা বাড়ার ফলে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতির আশঙ্কাও আরও প্রবল হচ্ছে। পরিবেশ ও প্রকৃতির ওপর ঝুম চাষের ক্ষতিকর প্রভাব হবে কিন্তু সুদূরপ্রসারী।

পরিবেশ ও প্রকৃতির দিক থেকে সমগ্র উত্তর-পূর্বভারত উপ-ক্রান্তীয় উষ্ণ গ্রীষ্ম মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার স্থানীয় জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা শুধু যে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাই নয়, বরং ভূমিক্ষয় রোধ ও মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধিতেও তা সাহায্য করে। স্থানীয় জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার এহেন অভিনবত্ব ও বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও এখানকার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির আশানুরূপ বিকাশ ঘটেনি। ঐতিহাসিক এবং কিছুটা ভৌগোলিক কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির অভাব রয়ে গেছে। সামগ্রিক বিচারে বলতে গেলে হিমঘর স্থাপন, বিপণনের সুবিধা তথা কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির ওপর আরও বেশি নজর দিতে হবে। সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই অঞ্চলের কৃষিক্ষেত্র বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে এবং কয়েক বছর আগে চালু হওয়া দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব উদ্যোগের আওতায় নতুন নতুন যেসমস্ত উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তবে একইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে এই অঞ্চলে এখনও বেশ কিছু

সমস্যা রয়ে গেছে যা আশু সমাধানের প্রয়োজন। উত্তর-পূর্বের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও কৃষিক্ষেত্র এই অঞ্চলের অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

তবে আপনাআপনি এই কাজে গতি আসবে না। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির অধিবাসীদের ৭৫ শতাংশেরই বেশি বাস গ্রামাঞ্চলে এবং তারা জীবিকার জন্য কৃষিক্ষেত্রের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু তথ্যানুযায়ী চাষের আওতায় থাকা জমির পরিমাণ ২০ শতাংশেরও কম, যেখানে দেশের বাকি অংশে চাষের আওতায় থাকা জমির পরিমাণ মোট ভূখণ্ডের ৪৫ শতাংশ।

ফলনের পরিমাণ এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বৈচিত্রের দিক থেকে বিচার করলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় পিছিয়ে। ফলে খাদ্যশস্য তো বটেই, এমনকী ফলমূল-সহ অন্য অনেক কৃষিজ পণ্যের জন্য দেশের অন্যান্য অংশের উপরই নির্ভর করতে হয় এই অঞ্চলকে।

অথচ উদ্যানপালন বা অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের মোট চা, ধান, রেপসিড, সরষে, পাট, আলু, রাঙা আলু, কলা, পেঁপে এবং বিভিন্ন ধরনের লেবুজাতীয় ফল, পত্রবহুল শাকসবজি, বিভিন্ন ভেষজ ও মশলাপাতি উৎপাদনে উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষ করে অসমের মতো রাজ্যের বিশেষ অবদান রয়েছে।

এছাড়া, কিশমিশ, কাজুবাদাম উৎপাদনে মেঘালয়ের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মণিপুরের মতো রাজ্যে আদা ও লঙ্কার চাষের পাশাপাশি বাঁশ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পণ্য প্রসার লাভ করতে পারে। নাগাল্যান্ডে খুব ভালো আনারসের চাষ হতে পারে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের কৃষি ও উদ্যানপালন ক্ষেত্রকে একসঙ্গে ধরে সামগ্রিক মাপকাঠিতে বিচার করলে সাফল্যের একটা সুন্দর ছবিই চোখে ধরা পড়ে। সেইসঙ্গে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একটা আশার বাণীও শোনা যায়।

মানুষের সামর্থ্য

উত্তর-পূর্বের মানুষের জীবনযাত্রা মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। তাই কৃষিকাজ এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, এমনকী যাঁরা পরিষেবা, শিল্পক্ষেত্র বা সরকারি ক্ষেত্রে কেতাদুরস্ত চাকরির স্বপ্ন দেখেন তাঁদের মধ্যেও কৃষিকাজের প্রতি একটা সহজাত প্রবণতা রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে মানুষের এই নিবিড় যোগাযোগের ফলে কৃষিকাজের চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান যেমন সুনিশ্চিত করা গেছে, তেমনই স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির পথও সুগম হয়েছে।

অরুণাচলপ্রদেশে 'ভেজা ধান ও মৎস্যচাষ'-এর মতো প্রথাগত জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় কোনও রকম অপচয় ছাড়াই সীমিত সম্পদের সাহায্যে দূষণহীন পদ্ধতিতে ধান উৎপাদন ও মৎস্যচাষ সম্ভব। জৈবচাষের ক্ষেত্রেও এটা একটা বড় পরীক্ষামূলক উদ্যোগ।

এ বছরের ১৮ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মধ্যে জৈব চাষে প্রথম সফল রাজ্য হিসাবে (অর্গানিক স্টেট) সিকিমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গত এক দশকের কঠোর পরিশ্রমে সিকিমের প্রায় ৭৫ হাজার হেক্টর জমিতে সফলভাবে দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিতে জৈব চাষ সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের মাটির গুণমান আরও উন্নত হয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য ভালো হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিতে ফলন বেড়েছে। রাজ্যের জৈবচাষ পদ্ধতির এই সাফল্য পর্যটন শিল্পকে আরও চাঙ্গা করে তুলবে বলেই আশা। নাগাল্যান্ডের ফেক জেলায় জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে 'জাবো পদ্ধতি'। এই পদ্ধতি অনুসারে পাহাড়ের উপরিভাগের অরণ্যাঞ্চলকে সংরক্ষণ করা হয় এবং মধ্যভাগে জল সংরক্ষণের জন্য জলাশয় তৈরি করা হয়। আর পাহাড়ের নিম্নদেশে থাকে গোচারণক্ষেত্র ও ধানখেত। এখানে পুকুর বা জলাশয়ের জলকে গোরু-ছাগল ইত্যাদি পশু বেঁধে রাখার উঠোনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করে ধানখেতের মধ্যে ফেলা হয়। এই জলের মধ্যে যে পশুর মূত্র বিষ্ঠা মিশে জমিতে পড়ে তার ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। চেরা বাঁশের নলের মধ্যে দিয়ে এই জল ধানখেতে ফেলা হয়।

কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে কীভাবে ধাপে ধাপে এই অঞ্চলের পটপরিবর্তন ঘটতে পারে এই প্রসঙ্গে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে—

(ক) বেকারত্ব, বিশেষ করে আধা-বেকারত্বের অবসান, ও

(খ) পানীয় জল, গ্রামীণ সড়ক, বুনিয়াদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভূমিহীনদের জন্য আবাসন বা ফসলের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির মতো মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সহায়তা, ও

(গ) মানুষের আয় ও সম্পদের মধ্যে বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ, ও

(ঘ) উচ্চতর বিকাশহার সুনিশ্চিতকরণ এবং অগ্রগতির এই ধারা বজায় রাখার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব।

মাটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় মানুষের জীবন। মাটিতেই মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি। তাই বারবার মাটির টানেই ফিরতে চায় মানুষ। অসমিয়া সাহিত্যে এমন কথাই ঘুরে ফিরে আসে। মাটির এই অনন্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র কৃষি।

পৃথিবীকে যখন 'মা' নামে ডেকে তার মাটির কোলে সন্তানেরা আশ্রয় নেয় তখনই নাকি যা কিছু মহৎ সব সৃষ্টি হয়। উত্তর-পূর্বের বাসিন্দাদের এমনটাই বিশ্বাস। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির অধিবাসীরা কৃষিকাজে দক্ষ এবং তারা তাদের ধরিত্রী মায়ের যত্ন নিতে জানে। আর জানে মায়ের আশীর্বাদ চাইতে। তারা কৃষিকাজের এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করতে জানে যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং সেইসঙ্গে দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিতে পরিবেশ-বান্ধবও বটে।

কৃষিকাজে বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এখানকার কৃষিকাজের বিভিন্ন পদ্ধতিকে দীর্ঘমেয়াদিভিত্তিতে সফল করে তুলেছে। এই সাফল্যই আনবে সুখ ও সমৃদ্ধি।❑

[লেখক 'দ্য স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রের নয়াদিল্লির বিশেষ প্রতিনিধি এবং 'রেনবোজ অ্যান্ড মিস্টি স্কাই : উইনডোজ টু নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া'; 'দ্য টকিং গানস : নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া'-সহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।
email : nirendev1@gmail.com]

গন্তব্য উত্তর-পূর্ব ২০১৬

কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক ও সংস্কৃতিমমন্ত্রক এ বছর ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লি-তে প্রথমবার 'গন্তব্য উত্তর-পূর্ব ২০১৬' উৎসবের আয়োজন করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন ড. জিতেন্দ্র সিং (স্বাধীন ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়নমন্ত্রক তথা কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, কর্মচারী, জন-অভিযোগ, পেনশন, পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ) এবং শ্রী কিরেণ রিজিজু (কেন্দ্রীয় রাজ্য মন্ত্রী, গৃহমন্ত্রক)।

এই তিন দিন ব্যাপী মহোৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বল প্রদর্শন। যুবা উদ্যোগপতি ও সদ্য স্থাপিত উদ্যোগ আকর্ষণ করতে আগামী কয়েক মাসে এই উৎসব মুম্বই ও বেঙ্গালুরু-তে আয়োজিত হবে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকও উত্তর-পূর্ব ভারতে তাদের নানান প্রকল্প সংক্রান্ত প্রদর্শন করতে পারবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য নেওয়া পদক্ষেপ, উত্তর-পূর্বে পর্যটনের সামগ্রিক বিকাশ (এক্সপ্লোরিং দ্য আনএক্সপ্লোর্ড বা অজানাকে জানা), আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তথ্য-প্রযুক্তি ও তথ্য-প্রযুক্তিচালিত পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য সম্ভাবনার মতো বিষয়ের ওপর আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। দ্বিতীয় দিন উত্তর-পূর্বে জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি, সার্বিক বিকাশের জন্য মাইক্রো-ফাইন্যান্স, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সদ্য স্থাপিত উদ্যোগের জন্য সম্ভাবনা ও সমস্যা, তন্তু-বস্ত্র-পোশাক মূল্যশৃঙ্খল বিকাশ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রয়োজনভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগের বিকাশ এবং দেশি ও বিদেশি বাজারে উত্তর-পূর্বের হস্তশিল্পকে দামি পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা নিয়ে আলোচনা হয়।

তৃতীয় দিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুসমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়—উত্তর-পূর্বের প্রথাগত লোকসংগীত ও নৃত্য, বিহু নাচ, মিশ্রিত লোকনৃত্য ও সংগীত, উত্তর-পূর্বের জনপ্রিয় রক মিউজিক দল 'রিভার্স ট্র্যাজেডি' ব্যান্ডের গান, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি-র ফ্যাশান শো, আর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্যুইজ, নাচ (একক ও দলীয়) ও গানের (হিন্দুস্থানি, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জনপ্রিয় সংগীত আর ধ্রুপদী) প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। এই উৎসবে পর্যটন, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগের বিকাশ, তথ্য-প্রযুক্তি, হস্ত-তন্তু ও হস্তশিল্প, জীবিকা, মাইক্রো-ফাইন্যান্স ও সদ্য স্থাপিত উদ্যোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ওপর বাণিজ্যিক সম্মেলনও আয়োজিত হয়।

এর পাশাপাশি, উৎসব চলাকালীন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যেকটা রাজ্যের স্টলগুলোতে সকলের জন্য স্থানীয় বস্ত্র, পরম্পরাগত বেশভূষা, শিল্পকলা, আসবাবপত্র, বাঁশের ওপর চিত্রকলা এবং স্থানীয় উপাদেয় খাদ্য উপভোগ করার সুযোগ ছিল।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

বহির্বিশ্ব

● **আইএস ঘাঁটিতে মার্কিন বিমান হানায় ৪৯ জঙ্গি হত :**

১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে লিবিয়ায় ত্রিপোলির পশ্চিমে সারবাথার কাছে ইসলামিক স্টেট আইএস-এর গোপন ঘাঁটিতে মার্কিন বোমারু বিমানের হামলায় কম করে ৪৯ জন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পেন্টাগন সূত্রে খবর, নিহত জঙ্গিদের বেশিরভাগই তিউনিসিয়ার নাগরিক। তাদের লিবিয়ায় আইএস-এর গোপন ঘাঁটিতে নিয়ে আসা হয়েছিল, অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে কয়েক জন 'সুইসাইড বম্বার'-ও রয়েছে।

তবে ওই বিমান হানায় কট্টর জঙ্গি নৌরুদ্দিন চৌচানে নিহত হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর তিউনিসিয়ায় আইএস-এর দু-দুটি হামলার ঘটনার মূল চক্রী ছিল চৌচানেই। ওই কট্টর জঙ্গি লিবিয়ার ওই গোপন ঘাঁটিতে গা ঢাকা দিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সেই খবর পেয়েই বিমান হানাদারি চালানো হয়েছিল। হানাদারির আগাম খবর পেয়ে চৌচানে ইতিমধ্যেই লিবিয়া ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও তারা নিশ্চিত নয় বলে মার্কিন গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে।

● **সাত দশকে এই প্রথম কিউবায় যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট :**

মার্চের মাঝামাঝি এক ঐতিহাসিক সফরে কিউবায় যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ওবামার আসন্ন ওই কিউবা সফরকে হোয়াইট হাউসের তরফে ১৮ ফেব্রুয়ারি 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ, গত সাত দশকে এই প্রথম কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট পা রাখতে চলেছেন কিউবায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মেয়াদ ফুরনোর আগে আরও একটি ইতিহাস গড়তে চলেছেন ওবামা।

'ঠান্ডা যুদ্ধ'-এর সময়ে ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর শত্রু। কমিউনিস্ট শাসনে থাকা কিউবার সঙ্গে দীর্ঘ চার-পাঁচ দশক মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু তার পর পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে যায় রাউল কাস্ত্রো কিউবায় ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাভানায় আর কিউবা ওয়াশিংটনে তাদের দূতাবাসও খোলে। কিছু দিন আগে রাউল কাস্ত্রোও ওয়াশিংটনে ঘুরে যান।

● **মায়ানমারে নোঙর করল দুই ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ :**

এবার মায়ানমারে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে দিল ভারত। মায়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গনের বন্দরে দুই ভারতীয় রণতরির নোঙরের খবর ১৭ ফেব্রুয়ারি সামনে এসেছে। নৌসেনার যে দুটি জাহাজ মায়ানমারে গিয়েছে, সেগুলি হল আইএনএস সরযূ এবং আইএনএস বিত্রা। ভারতীয় নৌসেনা জানিয়েছে, চোরাকারবার রুখতে ভারতীয় নৌসেনা বঙ্গোপসাগরে নজরদারি চালাচ্ছে। ইয়াঙ্গনে যুদ্ধজাহাজ পাঠানো সেই নজরদারিরই অঙ্গ।

মায়ানমারে সেনা শাসন চলাকালীন বেজিং-ইয়াঙ্গন ঘনিষ্ঠতার শুরু। কিন্তু সেনা শাসনের অবসান ঘটিয়ে মায়ানমারের নির্বাচনে আং সাং সু চি-র বিপুল জয় সে দেশের বিদেশনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। নতুন মায়ানমার ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে শুরু করেছে ভারতের সঙ্গে। জানুয়ারিতেই ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ ইয়াঙ্গনে হাজির হয়েছিল। এক মাস কাটতে না কাটতেই আবার ভারতীয় রণতরি নোঙর করেছে ইয়াঙ্গনে। এবার আর উপকূলরক্ষী বাহিনী নয়, নৌসেনা-ই যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে। এর আগে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতেও যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছিল ভারতীয় নৌসেনা।

● **ভারতে যুদ্ধবিমান তৈরির প্রস্তাব বোয়িং-এর :**

বিশ্বের বৃহত্তম যুদ্ধবিমান নির্মাতা সংস্থা বোয়িং ভারতের কাছ থেকে যুদ্ধবিমান তৈরির বরাত পেতে জোর দরবার শুরু করল। ভারতে এসে ভারতের জন্য যুদ্ধবিমান তৈরি করার প্রস্তাব তুলে ধরেছেন সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেফরি কোহলার। মার্কিন নৌসেনার জন্য যে এফ/এ-১৮ যুদ্ধবিমান বোয়িং তৈরি করে, ভারতেও সেই যুদ্ধবিমানই তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে বোয়িং।

ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম অস্ত্রশস্ত্র আমদানিকারকদের অন্যতম। তার পাশাপাশি ভারত অন্য দেশে সমরাস্ত্র অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি করাও শুরু করেছে। তবে গত অর্থবর্ষে ভারত আমদানি করেছে ৫৬০ কোটি ডলারের সমরাস্ত্র। সেখানে রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ১৫ কোটি ডলার। বোয়িং-এর প্রস্তাব, তাদের হাত ধরে ভারত এই রপ্তানির পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে নিক। অর্থাৎ, ভারতেই যুদ্ধবিমান তৈরি করবে বোয়িং। ভারতীয় বায়ুসেনা বোয়িং-এর সেই কারখানা থেকে দ্রুত যুদ্ধবিমান পাবে। তার পাশাপাশি ভারতের কারখানা থেকে গোটা বিশ্বে যুদ্ধবিমান রপ্তানিও করবে বোয়িং। তাতে লাভবান হবে ভারতীয় অর্থনীতি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিও অনেকটা গতি পাবে।

● **রাষ্ট্রসংঘের তদন্তকারী প্যানেল অ্যাসাঞ্জের পাশে দাঁড়াল :**

রাষ্ট্রসংঘের তদন্তকারী প্যানেল ৬ ফেব্রুয়ারি উইকিলিকস-প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের পাশে দাঁড়াল। প্যানেলের বক্তব্য, ইকুয়েডর দূতাবাসের 'বন্দিদশা' থেকে মুক্তি দেওয়া হোক অ্যাসাঞ্জকে। শুধু তাই নয়, 'স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ' করে যেভাবে তাঁকে 'আটকে' রাখা হয়েছে, তার জন্য দেওয়া হোক ক্ষতিপূরণও।

২০১০ সালে অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার দুটি পৃথক অভিযোগ আনেন দুই মহিলা। এর মধ্যে এক জন ধর্ষণের অভিযোগ করেন (যৌন হেনস্থার মামলাটি পরে তুলে নেওয়া হলেও ধর্ষণের মামলা বহাল রয়েছে)। জেরা করার জন্য অ্যাসাঞ্জকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায় সুইডেন। উইকিলিকস-প্রতিষ্ঠাতার অবশ্য দাবি ছিল, তাঁকে ফাসানো হয়েছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর বেশকিছু গোপন নথি ফাঁস করে দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইডেন আসলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মার্কিন

কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়ার ফন্দি এঁটেছে। এর পরই ২০১২ সালে লন্ডনের ইকুয়েডর দূতাবাসে আশ্রয় নেন অ্যাসাঞ্জ। ইউরোপে অ্যাসাঞ্জের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এখনও বহাল রয়েছে। অতএব ব্রিটেন এখনও তাঁকে সুইডেনের হাতে তুলে দিতে বাধ্য।

● **জিকা রুখতে রাষ্ট্রসংঘের গর্ভপাতের পরামর্শ :**

ইতিমধ্যেই ব্রাজিল-সহ দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার মানুষ এডিস ইজিপ্টাই মশাবাহিত জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। সংক্রমণের উপসর্গ বলতে হালকা জ্বর, সারা গায়ে ডেঙ্গির মতো লালচে দাগ, গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা ইত্যাদি। কিন্তু কোনও অন্তঃসত্ত্বা মহিলা যদি এ রোগে আক্রান্ত হন, তাহলে সন্তানের 'মাইক্রোসেফালি' হওয়া অবধারিত। ইতিমধ্যেই অন্তত ৪ হাজার শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এটি এক ধরনের স্নায়ুরোগ। শরীরের অন্য অংশের তুলনায় মাথা অনেক ছোট হয়। বয়স বাড়লেও মাথার খুলি বাড়ে না। কিন্তু বাড়তে থাকে মুখমণ্ডল। ফলে মুখ ক্রমশ অস্বাভাবিক চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে মাথা থেকে। বহু ক্ষেত্রে মৃত্যু হয়। না হলে পঙ্গু-জীবন।

জিকা ভাইরাস রুখতে এবার রাষ্ট্রসংঘের বার্তা, যদি বা কোনও ভাবে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন, তবে গর্ভপাত করান। যেসব দেশে এটি নিষিদ্ধ, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে সেখানেও অনুমতি দেওয়া হোক গর্ভপাতের, আর্জি রাষ্ট্রসংঘের। দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশে গর্ভপাত করানো নিষিদ্ধ। সন্তানের ভবিষ্যৎ জেনেও তাই গর্ভপাত করাতে পারছেন না বহু মা। জিকা-আক্রান্ত সেই সব দেশের উদ্দেশে রাষ্ট্রসংঘের আর্জি, ঘটনার গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনে গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হোক তাঁদের।

এই দেশ

● **ছিটমহল হস্তান্তরের পর এবার ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ :**

আশা করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগেই ছিটমহল হস্তান্তরের পর এপারে থেকে যাওয়া মানুষরা ভোটাধিকার পেয়ে যাবেন অনায়াসে। ছিটমহল হস্তান্তরের পর এ দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার দিতে তৎপর কেন্দ্রীয় সরকার। ১৭ ফেব্রুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনেই দুটি বিল সংশোধন করা হবে, যাতে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে নতুন করে আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ সম্পন্ন করা যায়।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। হস্তান্তরের প্রক্রিয়াতেও সব রকম সহযোগিতা করেছে কেন্দ্র। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধর্ম মেনেই রাজ্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চান।

● **মালদ্বীপে বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ পাঠাল ভারতীয় নৌবাহিনী :**

ভারত মহাসাগরে চীনকে চাপে রাখতে মালদ্বীপে দেশের বৃহত্তম বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ পাঠাল ভারত। ভারতীয় নৌবাহিনীর বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস-বিক্রমাদিত্য'-এর সঙ্গে পাঠানো হয়েছে ডেস্ট্রয়ার 'আইএনএস-মাইসোর' ও একটি ট্যাঙ্কার 'আইএনএস-দীপক'-ও। ভারতের এই পদক্ষেপ 'প্রোজেক্ট মৌসম'-এরই অঙ্গ।

জানুয়ারি মাসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ দূত হিসেবে মালদ্বীপে গিয়েছিলেন বিদেশ সচিব এস জয়শঙ্কর। তার কয়েক সপ্তাহ পর মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লা ইয়ামিন আবদুল গায়ুম ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়াতেই জানান, বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে ভারতের সঙ্গে আবার নতুন করে আলাপ-আলোচনা শুরু করবে মালদ্বীপ।

দক্ষিণ চীন সাগরের পর কিছু দিন ধরে ভারত সহাসাগরেও তার কর্তৃত্ব বাড়াতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বেজিং। কয়েক মাস আগেই পাকিস্তানের গাওয়াদার ও শ্রীলঙ্কার হাম্বানতোতা বন্দরে পৌঁছে গিয়েছে চীনা যুদ্ধজাহাজ। ভারত মহাসাগর এলাকার দেশগুলির ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় চীন। তারই প্রেক্ষিতে ভারতের এই সামরিক পদক্ষেপ বলে অনুমান বিশেষজ্ঞমহলের।

● **সুখোই যুদ্ধবিমান থেকে ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের প্রস্তুতি :**

ভারত ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা যৌথ উদ্যোগে যে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করেছে, সেই ব্রাহ্মস এখন পৃথিবীর ভয়ংকরতম ক্ষেপণাস্ত্রগুলির অন্যতম। ব্রাহ্মসের চেয়ে দ্রুতগামী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ব্রাহ্মসের পাল্লাও অন্যান্য অনেক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের চেয়ে বেশি। রাশিয়া এই ক্ষেপণাস্ত্রকে কম পাল্লায় বেঁধে রাখলেও, ব্রাহ্মসের ভারতীয় সংস্করণটির পাল্লা বাড়িয়ে তাকে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

পৃথিবীর এই সবচেয়ে দ্রুতগামী ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রকে ভূমি এবং সমুদ্রগর্ভ থেকে ইতিমধ্যেই সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে ভারত। শুধু আকাশ থেকে ব্রাহ্মস নিক্ষেপ বাকি। এবার সুখোই যুদ্ধবিমান থেকে ব্রাহ্মস ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইতিহাস তৈরির তোড়জোড় শুরু করে দিল ভারত। ব্রাহ্মসের মতো বড় এবং ভারী গোত্রের ক্ষেপণাস্ত্রকে পৃথিবীর কোনও দেশই এখনও যুদ্ধবিমান থেকে ছুড়তে পারেনি।

ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে গবেষণা অন্য অনেক দেশের চেয়ে বেশ কিছুটা দেরিতে শুরু করলেও দ্রুত উন্নতি করেছে ভারত। ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশগুলির সংগঠন 'মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম'-এ (এমটিসিআর) ভারতকে শামিল করতে এখন রাজি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ইতালির আপত্তিতে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

● **শৌচাগার নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শতায়ুকে প্রশংসা :**

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আরও এক প্রকল্প—'রারবান মিশন'। গ্রামীণ ও নগরোন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ এটি। সেই প্রকল্প সূচনার মঞ্চেই ২২ ফেব্রুয়ারি কুরুভাটে ১০৪ বছরের কুঁয়র বাইকে সংবর্ধনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী। আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অনগ্রসর মহিলাদের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ায় সমাজকর্মী ফুলবাসান বাই যাদবকেও সংবর্ধনা দেন নরেন্দ্র মোদী।

ছত্তিশগড়ের ধামতারি জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামের কুঁয়র বাই বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণের উপযোগিতা বুঝেছেন এবং সেই মতো পদক্ষেপও নিয়েছেন—বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণের জন্য নিজের ৮-১০টি ছাগল বিক্রি করে দিয়েছিলেন এই শতায়ু। তাঁর উদ্যোগেই ওই গ্রামের প্রতিটি ঘরে এখন শৌচাগার আছে। গ্রামীণ মহিলাদের কাছে বড় অনুপ্রেরণা তিনি। আর সেই কারণে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা কুড়োলেন ওই মহিলা।

ওই মহিলার দৃষ্টান্তই তুলে ধরেছেন নরেন্দ্র মোদী। গ্রামীণ স্তরে সচেতনতা বোধ গড়ে তোলার এই দৃষ্টান্ত পরিবর্তনশীল ভারতেরই প্রমাণ, দাবি প্রধানমন্ত্রীর। ২০১৯ সালের অক্টোবরের মধ্যে ভারতের প্রতিটি ঘরে যেন শৌচালয় হয়, সেই দিকেই এখন চোখ প্রধানমন্ত্রীর।

● **পাট শিল্প নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চালু নয়া আইন :**

৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ এবং ২০০৫ সালের জুট অ্যান্ড জুট টেক্সটাইলস (অ্যামেন্ডমেন্ট) কন্ট্রোল অর্ডার দুটি বাতিল করে জুট অ্যান্ড জুট টেক্সটাইলস কন্ট্রোল অর্ডার, ২০১৬ চালু করা হয়েছে। এই নতুন বিধি এনে শুধু কাঁচা পাট এবং চটের বস্তার দাম বেঁধে দেওয়ার মতো ব্যবস্থাই নয়, পাট শিল্পের পুরো নিয়ন্ত্রণ হাতে নিল কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক। কাঁচা পাট ও বস্তার বেঁধে দেওয়া দাম কেউ না-মানলে এর আওতায় তাঁকে জরিমানা করতে পারবেন কমিশনার। কাঁচা পাট মজুত, নিম্নমানের বস্তা সরবরাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারবেন।

প্রস্তাব অনুযায়ীই চালু হল পাট শিল্প নিয়ন্ত্রণে নতুন আইন। কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রকের আনা এই বিধি দেশের পাট শিল্পে এক শ্রেণির অসাধু চটকল মালিক এবং পাট ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি দূর করবে বলে মনে করছে শিল্পমহল। এর হাত ধরে জুট কমিশনার একদিকে যেমন কাঁচা পাট ও বস্তার দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, তেমনই অন্যদিকে মজুত উদ্ধার এবং তদন্তের পরে শাস্তিও দিতে পারবেন আইন-ভঙ্গকারীকে। নতুন বিধিতে চট শিল্পে কী ধরনের ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বেআইনি হিসাবে গণ্য হবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দেশের চট শিল্পে বছরে লেনদেনের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। পাট চাষি এবং শিল্পকে সহায়তা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এর মধ্যে সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাজার কোটির বস্তা কেন্দ্রীয় সরকারই কিনে নেয়।

এই রাজ্য

● **রক্তাল্পতায় ভুগছেন পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১২ রাজ্যের মহিলারা :**

২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদে পেশ হওয়া আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট ২০১৫-১৬-তে ধরা পড়েছে, এ রাজ্যের গর্ভবতী মহিলাদের ৫০ শতাংশের বেশি রক্তাল্পতার শিকার। এর প্রভাব পড়ছে তাঁদের গর্ভস্থ সন্তানের উপরেও। রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার-সহ ১২টি রাজ্যে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি গর্ভবতী মহিলাদের ৫০ শতাংশের বেশি রক্তাল্পতায় ভুগছেন।

কৈশোরে পা দেওয়ামাত্র মেয়েদের রক্তাল্পতার সমস্যা শুরু। প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত সেই সমস্যা থেকে মুক্তি নেই। সরকারি তরফে স্কুলে আয়রন ক্যাপসুল বিলি করে কিংবা গর্ভবতী মহিলাদের বাড়ি গিয়ে নানা ধরনের ওষুধ খাইয়েও এই সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি। গ্রামে অপুষ্টির পাশাপাশি খোলা জায়গায় শৌচকর্মের জেরে কৃমি হওয়া এবং তার জেরে রক্তাল্পতা বাড়ার মধ্যেও গভীর যোগাযোগ রয়েছে। তাই আয়রন ক্যাপসুল খাওয়ানোর পাশাপাশি শৌচাগারের সংখ্যা বাড়ানোর উপরেও আরও জোর দেওয়া প্রয়োজন।

● **জিকা সতর্কতা রাজ্যে :**

দক্ষিণ আমেরিকায় আতঙ্ক ছড়ানো জিকা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ২২ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তরের এক নির্দেশনামায় জানানো হয়েছে, এবার থেকে হাসপাতাল ও স্বাস্থকেন্দ্রের নবজাতকদের মধ্যে কেউ 'মাইক্রোসেফালি'-তে আক্রান্ত হয়েছে কি না, তা বাধ্যতামূলকভাবে পরীক্ষা করে স্বাস্থ্য ভবনে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

'মাইক্রোসেফালি' হল এক ধরনের 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিস-অর্ডার'। এর ফলে শিশুর স্নায়ুর স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত এডিস ইজিপ্টাই মশা কোনও গর্ভবতীকে কামড়ালে তাঁর সন্তান ওই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, এই এডিস প্রজাতির মশা ডেঙ্গু রোগেরও বাহক।

● **কৈলাস সত্যার্থীকে আইনের সাম্মানিক ডি লিট :**

শিশুদের অধিকার ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এবার আইনের সাম্মানিক ডি লিট দেওয়া হল বিশিষ্ট ভারতীয় শিশু অধিকার কর্মী নোবেল-জয়ী কৈলাস সত্যার্থীকে। ২০ ফেব্রুয়ারি, সল্টলেকে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিকাল সায়েন্সেস'-এর কনভোকেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত কৈলাস সত্যার্থীর হাতে সেই সংক্রান্ত শংসাপত্র তুলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অনিল আর ডাভে।

কৈলাস সত্যার্থী ১৯৫৪ সালের ১১ জানুয়ারি মধ্যপ্রদেশের বিদিশায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সংগঠন 'বাচপান বাঁচাও আন্দোলন' ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আশি হাজারেরও বেশি শিশুকে ক্রীতদাসত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মুক্ত করেছে এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন, পুনর্বাসন ও শিক্ষায় সহযোগিতা করেছে। মালালা ইউসুফজাইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে তাঁকে ২০১৪ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

● **রাজ্যে আরও ছটি ভাসমান ফাঁড়ি :**

বঙ্গোপসাগরে নিরাপত্তা বাড়াতে আরও ছটি ভাসমান আউটপোস্ট বা ফাঁড়ি তৈরি করছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তাদের কলকাতা সেক্টরের ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ জলপথে এখন এই ধরনের ফাঁড়ি আছে তিনটি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও ছটি ফাঁড়ি তৈরির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে।

বিএসএফ সূত্রের খবর, বঙ্গোপসাগরে নজরদারির জন্য ২০০২ সালের আগে তাদের মাত্র তিনটি আউটপোস্ট ছিল। তিনটিই স্থলভূমিতে। নিরাপত্তার খাতিরে আরও বেশি ফাঁড়ি গড়ার প্রয়োজন হলেও জমির সমস্যার জন্য তা হয়ে ওঠেনি। ২০০২-এ তিনটি ভাসমান আউটপোস্ট তৈরি করে বিএসএফ। বিএসএফ-এর বক্তব্য, ইদানীং সুন্দরবনের জলপথকে বেআইনি কাজে ব্যবহারের কিছু ঘটনা ঘটেছে। সেই জন্য এই ধরনের ফাঁড়ি দরকার।

● **নাবার্ড চায় রাজ্যে ঋণ বাড়াতে :**

আগামী তিন বছরের মধ্যে কৃষি এবং বিভিন্ন ধরনের খামারের কাজে যুক্ত চাষি ও শ্রমিকদের আয় প্রায় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে নাবার্ড। এর জন্য কৃষি, পরিকাঠামো-সহ বিভিন্ন গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার পরিমাণ ৩০ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। রাজ্যে তাদের ঋণ পরিকল্পনা নিয়ে সম্প্রতি এক সভায় নাবার্ডের চিফ জেনারেল ম্যানেজার টিএস রাজি গিয়ানি এ কথা জানিয়ে বলেন, আগামী অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ঋণদান ১৪.০৮ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্য তাঁদের।

বর্তমানে গ্রামে কৃষি ক্ষেত্রে প্রতি পরিবারের আয় মাসে গড়ে ৩,৯৮০ টাকা। তা বাড়িয়ে মাসে ৫,৮৮৮ করাই নাবার্ডের উদ্দেশ্য, যে-কারণে এই বাড়তি ঋণ জোগানোর পরিকল্পনা। আগামী আর্থিক বছর, অর্থাৎ ২০১৬-১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ক্ষেত্রে নাবার্ড ৮২,৭৮৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণদানের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। যা ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ১৪.০৮ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি সংগৃহীত মোট আমানতের ৭০ শতাংশ ঋণ (ক্রেডিট-ডিপজিট রেশিও) হিসাবে দিতে রাজ্যের ব্যাংকগুলিকে আর্জি জানিয়েছে নাবার্ড।

● **পাটজাত পণ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা :**

চটের বস্তা বাদে অন্যান্য ধরনের পাটজাত পণ্য তৈরি বাড়াতে চায় কেন্দ্র। এজন্য প্রশিক্ষণে জোর দিতে চায় কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রক। সম্প্রতি রাজ্যে এ ধরনের ৩টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার। ওই কেন্দ্রগুলি চালানো হবে এনজেএমসি-র বন্ধ চটকলে।

পাট পর্ষদ আয়োজিত সভায় গাঙ্গোয়ার ঘোষণা করেন রাজ্যে নতুন করে আরও দুটি কমন ফেসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) চালু করার কথা। সেগুলি হবে সুন্দরবন এবং জলপাইগুড়িতে। এ দুটি কেন্দ্র চালু হলে ৪০০ জনের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করেন বস্ত্রমন্ত্রী। ওই সব সিএফসি-তে পাটজাত পণ্যের নকশা, উৎপাদনের মান বাড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়াও পণ্যগুলি বিপণনে সহায়তাও দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। গাঙ্গোয়ার জানান, এ ধরনের কাজ করার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রকে ২ কোটি টাকা করে দেওয়া হবে।

এদিকে, পাটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বার করার লক্ষ্যে গবেষণায় জোর দেওয়া হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন বস্ত্রমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বিশেষ করে জমির ভাঙন রোখার ক্ষেত্রে পাট ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই এই বিষয়টির উপর আলাদা করে জোর দিচ্ছেন তাঁরা।

● **নেট দুনিয়ার জন্য প্রস্তুতির সমীক্ষায় পিছিয়ে রাজ্য :**

নেটের সুবিধা কাজে লাগাতে কোন রাজ্যে কতটা তৈরি (ইন্টারনেট রেডি), সম্প্রতি তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরি করেছে ইন্টারনেট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (আইএএমএআই)। দেখা হয়েছে, কোন রাজ্যে নেট-পরিকাঠামো কেমন। যাচাই করা হয়েছে ইন্টারনেট মারফত সরকারি পরিষেবা, নেট-জগতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ, তথ্য-প্রযুক্তি পরিষেবা (যেমন, ই-কমার্স) ব্যবহারের মতো বিষয়। মূলত এই সমস্ত মাপকাঠির ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে রাজ্যগুলির ই-প্রস্তুতির সূচক। শীর্ষে মহারাষ্ট্র। তারপরে যথাক্রমে কর্ণাটক, গুজরাত, তেলঙ্গানা ও তামিলনাড়ু। আর পশ্চিমবঙ্গের ঠাঁই হল ২১টি বড় রাজ্যের মধ্যে ১৭ নম্বরে।

বেহাল দশার ছবি উঠে এসেছে 'ই তাল'-এও। সারা দেশে বিভিন্ন ই-গভর্ন্যান্স প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন (ই-ট্রানজাকশন) কেমন হচ্ছে, তার হিসেব রাখে কেন্দ্রের ওয়েব পোর্টাল ই-তাল। সেখানকার তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ই-গভর্ন্যান্সে প্রতি হাজার মানুষ গড়ে আর্থিক লেনদেন করেন মাত্র ১১২.২০টি। যেখানে কেরালায় তা ১,১২২টির বেশি। তেলঙ্গানায় তিন হাজার ছুঁইছুঁই। নয় হাজারের বেশি গোয়ায়। গুজরাত আটশোর উপরে। তুলনায় পিছিয়ে থাকা মেঘালয় এবং ছত্তিশগড়ে যথাক্রমে ১৮৪.২০ ও ৪৭৭.২০। পশ্চিমবঙ্গের দ্বিগুণেরও বেশি জনসংখ্যার উত্তরপ্রদেশেও ওই সংখ্যা ১৪৮.৩০। তেলঙ্গানায় মোট ই-লেনদেনের সংখ্যা ১০ কোটির বেশি। অনেক পিছন থেকে উঠে আসা মধ্যপ্রদেশে ৬ কোটির উপরে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত মাত্র ১ কোটি ই-ট্রানজাকশন হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই সমস্ত পরিসংখ্যানেরই সময়কাল চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির দশ তারিখ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে ই-গভর্ন্যান্স মাধ্যমে দেওয়া পরিষেবার সংখ্যাতেও। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ যেখানে যথাক্রমে ১৮২, ১৫১ ও ১২৯টি পরিষেবা দেয়, সেখানে রাজ্যে দেয় ৭০।

● **রাজ্য দূষণ পর্ষদের তুর্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে সায় :**

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে রাজ্যের প্রস্তাবিত 'তুর্গা পাম্পড স্টোরেজ' প্রকল্পে অনুমোদন দিল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এর ফলে তুর্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের সম্ভাবনা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে। এর পর কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্রটি পেয়ে গেলেই তুর্গা পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প গড়ার ব্যাপারে পরিবেশ সংক্রান্ত কোনও বাধা আর থাকবে না। সব শেষে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সংস্থা 'সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি'-র অনুমোদন।

প্রকল্পটি তৈরি হলে চারটি ইউনিট মিলিয়ে ১০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা। দশম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় অযোধ্যা পাহাড়েই ৯০০ মেগাওয়াটের পুরুলিয়া পাম্পড স্টোরেজ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি গড়ে ওঠার পরে, রাজ্যের নতুন সরকার তার পাশেই তুর্গা পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পটি নির্মাণের পরিকল্পনা করে। ২৫০ মেগাওয়াট করে চারটি ইউনিট মিলিয়ে মোট ১০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রকল্পটির প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছিল ২০১২ সালে। এখন সেই প্রকল্পটির চূড়ান্ত নকশা তৈরি করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ওয়াপকস।

প্রসঙ্গত, পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পে দুটি জলাধার থাকে, যেগুলির মধ্যে উচ্চতার ফারাক যথেষ্ট। যে কারণে সাধারণত পাহাড়ি এলাকাতেই প্রকল্প গড়া হয়। নীচের জলাধারটি থেকে উপরেরটিতে পাম্প করে জল তোলা হয়। চাহিদার সময়ে টার্বাইন চালিয়ে জল ফের নীচে পাঠিয়ে তৈরি হয় জলবিদ্যুৎ।

অর্থনীতি

● **দেশের প্রথম সোনার খনি নিলাম :**

এবার সরাসরি ভারতের সোনার খনিগুলি নিলামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার আওতায় প্রথম নিলামে ছত্তিশগড়ের বাঘমারা খনিটি জিতল বেদান্ত। নিলামে ইন্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইন্সের স্থির করে দেওয়া দামের উপর ১২.৫৫ শতাংশ। দর হেঁকেছে লন্ডনের বেদান্ত রিসোর্সেসের শাখা সংস্থাটি। প্রতি ট্রয় আউন্সের (৩১.১০ গ্রাম) দাম স্থির হয়েছিল ৭৪,৭১২ টাকা। ব্যুরোর এক কর্তার মতে, এই খনিতে প্রায় ২,৭০০ কেজি সোনা রয়েছে। দু বছরের মধ্যে উত্তোলন শুরু হবে বলে তাঁর আশা। সময়মতো এই ৬.০৮ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের খনিতে কাজ শুরু নিয়ে আশাবাদী বেদান্তও।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই কমপক্ষে তিনটি খনি নিলামের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দেশে সোনার চাহিদা মেটাতে এবং আমদানি কমাতে এর আগেই বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র সরকার। যার

মধ্যে রয়েছে আমদানি শুল্ক বাড়ানো এবং সোনা জমা প্রকল্প ও বন্ড আনা ইত্যাদি।

● **রপ্তানি ফের সংকুচিত, কমলো পাইকারি দর :**

১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে জানুয়ারিতে পাইকারি দর সরাসরি কমেছে ০.৯০ শতাংশ হারে। টানা ১৫ মাস ধরেই নীচে নামছে পাইকারি মূল্য সূচকের ভিত্তিতে হিসাব করা এই হার। তবে বাজারে তার প্রভাব তেমন পড়ছে না বলেই উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি জানুয়ারিতে ছুঁয়েছে ৫.৬৯ শতাংশ, যা গত দেড় বছরে সবচেয়ে বেশি। পাশাপাশি, উদ্বেগ বাড়িয়ে জানুয়ারি মাসে রপ্তানি কমেছে ১৩.৬ শতাংশ। এই নিয়ে টানা ১৪ মাস ধরে সংকুচিত হয়ে তা দাঁড়িয়েছে ২১০০ কোটি ডলারে। তবে সোনা আমদানি ৮৫ শতাংশ বেড়ে পৌঁছেছে প্রায় ৩০০ কোটি ডলারে।

দাম সরাসরি কমার অর্থ মূল্যবৃদ্ধি নেমেছে শূন্যের নীচে। তবে দর পড়লেও গত ২০১৫-র সেপ্টেম্বর তা কিছুটা বাড়ার মুখ নিয়েছে। যেমন, ডিসেম্বরে পাইকারি মূল্যবৃদ্ধি ছিল (–) ০.৭৩ শতাংশ। জানুয়ারিতে অবশ্য খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি তার আগের মাসের ৮.১৭ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৬.০২ শতাংশ। এদিকে, বিশেষজ্ঞদের মতে জানুয়ারিতেও রপ্তানি কমার মূল কারণ বিশ্ব বাজারে চাহিদায় ঘাটতি। তবে আমদানিও ১১ শতাংশ কমে ২৮৭১ কোটি ডলার হয়েছে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি নেমে এসেছে ৭৬৩ কোটিতে, যা ১১ মাসে সবচেয়ে কম।

● **মূলধনি পণ্যের জন্য আলাদা নীতি :**

মূল লক্ষ্য দেশে কলকারখানার মোট উৎপাদনে মূলধনি পণ্যের পরিমাণ এখনকার ১২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ করা। মূলধনি পণ্যের জন্য এই প্রথম আলাদা নীতি ঘোষণা করল কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রী অনন্ত গীতে ১৬ ফেব্রুয়ারি একথা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটিতে ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছেন। গত বছরেই এর খসড়া তৈরি হয়।

● **'নেট নিউট্রালিটি'-র পক্ষে ট্রাই :**

নতুন নিয়ম জারি করে ৮ ফেব্রুয়ারি টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ট্রাই) জানাল, ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মাশুল নিতে পারবে না কোনও সংস্থাই। নিরপেক্ষ নেটের শর্ত মানতে সবাইকেই এক সুবিধা দিতে হবে।

'নেট নিউট্রালিটি' কী? নিরপেক্ষ বা অবাধ ইন্টারনেট। অর্থাৎ, সব সাইটের একই মাশুল, কোনওটা বিনামূল্যে, কোনওটার জন্য পয়সা লাগবে—তা নয়। বিতর্কের সূত্রপাত কয়েকটা সংস্থার বিনামূল্যে কিছু বাছাই করা অ্যাপ ও ওয়েবসাইট পরিষেবাকে কেন্দ্র করে। সেখানে নেটের জন্য আলাদা মাশুল দিতে হত না গ্রাহককে। সংস্থাগুলির দাবি ছিল, বিনামূল্যে পরিষেবা মিললে দ্রুত ছড়াবে নেট ব্যবহার। কিন্তু প্রতিবাদীদের বক্তব্য, বিনামূল্যে পরিষেবার কথা বলা হলেও আসলে তা গ্রাহকদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করবে। কারণ একই পরিষেবার জন্য ভিন্ন ধরনের মাশুল দিতে হবে তাঁদের এবং গ্রাহকের পছন্দের স্বাধীনতাই খর্ব হত নিরপেক্ষ নেট না থাকলে।

এ দিন 'প্রোহিবিশন অব ডিস্ক্রিমিনেটরি ট্যারিফস ফর ডেটা সার্ভিসেস রেগুলেশন্স, ২০১৬' শীর্ষক ওই বিধি ঘোষণা করে ট্রাই চেয়ারম্যান আর এস শর্মা জানান যে কোনও সংস্থাই নেট পরিষেবার জন্য বৈষম্যমূলক মাশুল নিতে পারবে না। এ দিন থেকেই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। অমান্য করলে দিনে ৫০ হাজার টাকা (সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা) জরিমানা দিতে হবে সংস্থাকে। তবে ট্রাই বলেছে, এখন এই নিয়মের পরিপন্থী যেসব প্রকল্প আছে, সেগুলি চালু হওয়া থেকে ছয় মাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। টেলিকম মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ ও বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও ট্রাইয়ের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন।

● **নতুন আয়কর নির্দেশিকা :**

আয়কর রিফান্ড ও বাড়তি করের দাবি দ্রুত মিটমাট করার ব্যাপারে নতুন নির্দেশিকা আনল প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ। ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত রিফান্ডের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়করদাতার কাছে একই সঙ্গে কোনও বাড়তি করের দাবি থাকলে তা খতিয়ে দেখে প্রদেয় কর বাদ দিয়ে টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

সেক্ষেত্রে দ্রুত বিষয়টির মীমাংসা সম্ভব হবে বলে দাবি পর্ষদের। প্রসঙ্গত, গত এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত আয়কর বিভাগ ৬৫ হাজার কোটি টাকার রিফান্ড মিটিয়েছে বলে দাবি।

এর পাশাপাশি, ই-মেলের মাধ্যমেই করদাতাকে আয়কর সংক্রান্ত নোটিস পাঠাবে আয়কর দপ্তর। যার উত্তরও দেওয়া হবে ই-মেলের মাধ্যমে। এজন্য মেল-আইডি দপ্তরে নথিভুক্ত থাকতে হবে।

● **১১৪ শতাংশ বাড়ল প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি :**

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ১১৪ শতাংশ বাড়ল প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির (এফডিআই) পরিমাণ। কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, তা দাঁড়িয়েছে ৪৫০ কোটি ডলারে। এমনকী বিশ্বে যেখানে এফডিআই ১৬ শতাংশ হারে কমেছে, সেখানেই দেশে তা ৩৮ শতাংশ হারে বাড়ছে বলে ৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এদিকে, ভারতে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে বিদেশি মুদ্রা লেনদেন আইনের আওতায় নয়টি নীতি পরিবর্তন করেছে রিজার্ভ ব্যাংক।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **সুইডিশ-কানাডিয়ান বিজ্ঞানীর বানানো যন্ত্রমানবী :**

ক্ষরিক অর্থেই যন্ত্র ও মানুষ। কারণ এ যন্ত্রের 'মান'-ও আছে, 'হুঁশ'-ও আছে। যন্ত্রমানবী নাদিন। রূপে-গুণে-কাজে-কর্মে মানুষের মতোই। এহেন 'নাদিন'-কে বানিয়েছেন সিঙ্গাপুরের 'ন্যানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি'-র সুইডিশ-কানাডিয়ান অধ্যাপিকা নাদিয়া থ্যালমান, অনেকটা নিজের চেহারার আদলেই।

জাপান প্রথম যন্ত্র-মানুষ বানালেও নাদিন অন্যদের থেকে আলাদা। সফটওয়্যার-এর 'অনুভূতি' পুরে দেওয়া হয়েছে নাদিনের শরীরে। রাখা হয়েছে স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, আদবকায়দা, কথা বলা, অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের মতো ক্ষমতাও। তাছাড়াও, মানুষের চেহারা দিতে নাদিনের যান্ত্রিক দেহে বসানো হয়েছে কৃত্রিম চামড়া। পেশির পরিবর্তে বসানো হয়েছে 'এয়ার মোটর'। যা বজায় রাখবে চামড়ার টানটান ভাব। মুখে ফুটিয়ে তুলবে রাগ, দুঃখ, আনন্দ, উচ্ছ্বাস।

● **স্কুলবাসে শিশু সুরক্ষায় আইআইটি-র অ্যাপ :**

স্কুলের পথে ছোটদের রক্ষা করতে একটি বিশেষ অ্যাপ নিয়ে এগিয়ে আসছে খড়্গপুর আইআইটি। স্কুলগাড়ি বা বাসে ছাত্রছাত্রীরা

কতক্ষণ থাকছে, বাস বা গাড়ি কোন কোন রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে—সবই জানা যাবে ওই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। অর্থাৎ বাচ্চার যাতায়াতের পুরোটাই থাকবে অভিভাবকের নজরদারির আওতায়।

যেসব স্কুল এই অ্যাপ ব্যবহার করবে, তাদের প্রত্যেক পড়ুয়ার পরিচয়পত্রের পিছনে একটি চিপ লাগিয়ে দেওয়া হবে। স্কুলবাস বা পুলকারে থাকবে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস)। যখনই কোনও ছাত্র বা ছাত্রী বাসে উঠবে এবং বাস থেকে নামবে, সঙ্গে সঙ্গে বার্তা পৌঁছে যাবে অভিভাবকের মোবাইলে। পাশাপাশি বাসের যাত্রাপথটি সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশের ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমে দেখতে পাবেন কর্মরত অফিসারেরা। বাসটি যদি কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে অথবা কোনও এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তাও জানা যাবে অ্যাপে।

● **তিন দিনে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে মহাকাশযান পাঠাবে নাসা :**

একেবারে সর্বাধুনিক 'লেসার' প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবী থেকে তিন দিনে 'লাল গ্রহে' রকেট পাঠানো যাবে বলে জানিয়েছেন সান্টা বারবারার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফিলিপ লুবিন। নাসার সদ্য-আবিষ্কৃত ওই প্রযুক্তির নাম 'ফোটনিক প্রোপালসান'।

রওনা হওয়ার আগে পৃথিবী থেকে পুরে দেওয়া জ্বালানি ছাড়া, এতদিন মহাকাশে ছোটার জন্য মহাকাশযানগুলি নির্ভর করত সূর্যের আলো থেকে নেওয়া 'ফোটন' কণার ওপর। কিন্তু, এবার নতুন প্রযুক্তিতে পৃথিবী থেকেই 'লেসার' রশ্মি দিয়ে ওই অসম্ভব রকমের দ্রুতগতিতে ছোটানো যাবে মহাকাশযানকে।

২০৩০ সালে মঙ্গলে মহাকাশচারী পাঠানোর যে ভাবনা রয়েছে নাসার, তাতে পৃথিবী থেকে প্রচলিত পদ্ধতিতে 'লাল গ্রহে' যেতে সময় লাগার কথা ছয় মাস। কিন্তু, 'লেসার' প্রযুক্তিতে সেই মহাকাশযান পাঠাতে এবার তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না বলে নাসার তরফে জানানো হয়েছে। মানে, কলকাতা থেকে লন্ডন বা প্যারিস হয়ে নিউ ইয়র্কে যেতে যতটা সময় লাগে, তার চেয়ে মাত্র এক-দেড় দিন সময় বেশি লাগবে 'লাল গ্রহে' যেতে! কোনও কল্প-কথা নয়। নতুন এই প্রযুক্তি-প্রকৌশল উদ্ভাবনের কৃতিত্ব নাসার।

● **মহাকাশে চিনির সন্ধান উস্কে দিল প্রাণের ইঙ্গিত :**

একেবারে হালে মহাকাশে তাল তাল চিনির হদিশ মেলায় এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্রও যে প্রাণ রয়েছে অনিবার্যভাবে, সেই বিশ্বাসই জোরালো হয়ে উঠল। কারণ, চিনিই প্রাণের মূল উপাদান রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA তৈরির জন্য সিঁড়ির প্রথম ধাপ। চিনি যখন আছে আর প্রাথমিক তথ্য যা জানাচ্ছে, সেই নিরিখে বলাই যায়, এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে অনিবার্যভাবেই জন্ম নিয়েছে প্রাণের অন্যতম মূল উপাদান RNA অণু। তাই প্রাণ নিশ্চয়ই রয়েছে মহাকাশের অন্য কোথাও।

সেই বিশ্বাসটাই আরও জোরালো হয়েছে এ ব্যাপারে হালে 'অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারস'-এ প্রচুর তথ্যপ্রমাণ-সহ একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ায়। কোপেনহাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিলস্ বোর ইনস্টিটিউটের জ্যোতির্রসায়নবিদ জার্স কে জোয়েরগেনসেন, ডেনমার্কের আরহাস বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ সিসিলি ফ্যাব্রে ও চার সহ-গবেষকের ওই প্রবন্ধে মহাকাশের কোথায় কোথায়, কী পরিমাণে প্রাণের মূল উপাদানের হদিশ মিলেছে, সেসব তথ্যপ্রমাণ-সহ তুলে ধরা হয়েছে। "Detection of Simplest Sugar, Glycoaldehyde in A Solar Type Proto Star with ALMA" শীর্ষক ওই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত মহাকাশের দুটি জায়গায় প্রাণের এই অন্যতম মূল উপাদানের হদিশ মিলেছে।

● **হাব্‌লের চেয়ে ১০০ গুণ বড় টেলিস্কোপ :**

'হাব্‌ল স্পেস টেলিস্কোপ' (এইচএসটি)-এর চেয়ে একশো গুণেরও বেশি বড় আকারের টেলিস্কোপ এবার মহাকাশে পাঠাচ্ছে নাসা। যার নাম 'ওয়াইড ফিল্ড ইনফ্রারেড সার্ভে টেলিস্কোপ' (ডব্লিউএফআইআরএসটি)। ওই 'মাল্টি-ফাংশনাল' টেলিস্কোপ যে শুধুই এই সৌরমণ্ডলের বাইরে ব্রহ্মাণ্ডের লুকোনো জগৎ খুঁজবে তাই নয়, সন্ধান করবে ভিন গ্রহে প্রাণেরও। তারই সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বর, নিউট্রন নক্ষত্রের মতো অজানা মহাজাগতিক বস্তুও খুঁজবে ওই নতুন শক্তিশালী টেলিস্কোপ। সন্ধান করবে এ তাবৎ হদিশ না মেলা 'ডার্ক ম্যাটার' ও 'ডার্ক এনার্জি'-রও।

ওই টেলিস্কোপে প্রায় আড়াই মিটার লম্বা 'করোনাগ্রাফ' যন্ত্রটি এই সৌরমণ্ডলের বাইরে অন্যান্য নক্ষত্রমণ্ডলেও পৃথিবীর মতো কোনও বাসযোগ্য গ্রহ রয়েছে কি না, তারও সন্ধান করবে। ২০১৮ সালে 'জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ' (জেডব্লিউএসটি) পাঠানোর পরেই এই শক্তিশালী টেলিস্কোপ 'ডব্লিউএফআইআরএসটি' মহাকাশে পাঠানো হবে।

● **মহাকর্ষ-তরঙ্গের হদিশ, সাফল্যের সঙ্গী ভারত :**

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ২০১৬-র ১১ ফেব্রুয়ারি গণ্য হল 'রেড লেটার ডে' হিসেবে। ওয়াশিংটনে 'ইউএস ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে বিজ্ঞানী ডেভিড রিৎজ ঘোষণা করলেন যে মহাকর্ষ-তরঙ্গের খোঁজ পাওয়া গেছে।

ওই ঘোষণায় বিশ্বজুড়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের উল্লাসের ভাগীদার হলেন ভারতীয় গবেষকেরাও। পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষভাবে। ওয়াশিংটনের ওই সাংবাদিক বৈঠক সরাসরি দেখানো হচ্ছিল এখানে 'ইন্টার ইউনিভার্সিটি সেন্টার ফল অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিক্স (আইইউসিএএ)'-র চন্দ্রশেখর অডিটোরিয়ামে। ওয়াশিংটনে ঘোষণার কয়েক মিনিট পরেই দিল্লি থেকে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ববিজ্ঞানের ওই সাফল্যকে এবং এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অভিনন্দন জানালেন।

পৃথিবীজুড়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা উল্লসিত। কারণ, আরও একবার পরীক্ষায় পাশ করলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। হ্যাঁ, আরও একবার অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন, মহাবিশ্বকে ভালোভাবে চিনতে হলে কেন দ্বারস্থ হতে হবে শুধু তাঁরই। কেন আইজ্যাক নিউটনের ভাবনার আশ্রয়ে সবটা চেনা যাবে না।

বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন, মহাশূন্যে ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটলে (প্রচণ্ড ভারী দুটি নক্ষত্রের একে অন্যকে চক্কর কিংবা দুটো ব্ল্যাকহোলের সংঘর্ষ এবং মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়া), সেসব থেকে চারদিকে এক ধরনের তরঙ্গ বা ঢেউ ছড়ায়। যার নাম মহাকর্ষতরঙ্গ। বিজ্ঞানী রিৎজ জানালেন, ১৩০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে সূর্যের থেকে ২৯ গুণ এবং ৩৬ গুণ ভারী দুটো ব্ল্যাকহোল একে অন্যের সঙ্গে মিশে একটা ব্ল্যাকহোলে পরিণত হওয়ার সময় ওদের চারপাশে 'স্পেসে' যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, তা গত বছর ১৪ সেপ্টেম্বর

পৃথিবীর যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। এমন তরঙ্গের অস্তিত্ব যে থাকতে পারে, তা জানা গিয়েছিল ঠিক ১০০ বছর আগে, আইস্টাইনের 'জেনারেল রিলেটিভিটি'-র তত্ত্ব থেকে। বাস্তবে সেই তরঙ্গের অস্তিত্ব শনাক্ত করতে লাগল ১০০ বছর।

খেলার জগৎ

● **সাউথ এশিয়ান গেমস :**

দক্ষিণ এশিয়ার বহুমাত্রিক-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাউথ এশিয়ান গেমসের ১২তম আসর ৫ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি গুয়াহাটি ও শিলংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ আসরে অলিম্পিকের ২২টি খেলার জন্য নির্ধারিত ২২৬টি ইভেন্টে ৮টি দেশের ২,৬৭২ জন ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রতিযোগিতায় ভারত সর্বোচ্চ ১৮৮টি স্বর্ণ পদক-সহ মোট ৩০৮টি পদক জয়লাভ করে।

● **ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়ানশিপ :**

১৫-২১ ফেব্রুয়ারি হায়দরাবাদে ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপ-এর আয়োজন করা হয়। ইন্দোনেশিয়া ও চীন যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলাদের শ্রেণিতে জয়ী হয়। উভয় শ্রেণিতেই ফাইনালে হেরে যায় জাপানি দল। পুরুষদের বিভাগে দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারত যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে। মহিলাদের বিভাগেও তৃতীয় স্থান পায় দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় দল। এই বিভাগের চতুর্থ স্থান দখল করে থাইল্যান্ড।

● **আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ :**

বাংলাদেশে ২২ জানুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এটি এই একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের একাদশতম সংস্করণ এবং ২০০৪ সালের পরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় যুব বিশ্বকাপ।

এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বকাপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের সদস্যভুক্ত ১৬টি জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল অংশ নেয় এবং সব ম্যাচ অনূর্ধ্ব-১৯ একদিনের আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। আইসিসি পূর্ণ সদস্য হিসেবে দশটি দল টুর্নামেন্টের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ্যতা অর্জন করে, অন্যদিকে বাকি পাঁচটি দল আঞ্চলিক বাছাইপর্বে জয় লাভের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করে। ২০১৫ আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব-এর বিজয়ী টুর্নামেন্টের শেষ জায়গাটি লাভ করে, এই বাছাইপর্বে পাঁচটি আঞ্চলিক বাছাইপর্বের রানার্স-আপ হওয়া দল অংশ নেয়। ৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে এই বিশ্বকাপ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার দলের স্থানে বিকল্প হিসেবে আয়ারল্যান্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বাংলাদেশ ও নামিবিয়ার কাছে পর-পর হেরে, আগের বারের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ আফ্রিকা টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে পড়ে। ফাইনালে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচ উইকেটে ভারতকে পরাজিত করে তাদের প্রথম অনূর্ধ্ব-১৯ শিরোপা লাভ করে। বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের জ্যাক বার্নহাম ও নামিবিয়ার ফ্রিটজ কুটজি যথাক্রমে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান ও সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহ করেন।

বিবিধ সংবাদ

● **উদ্ধার জৈন চৌমুখা :**

চারপাশে চার তীর্থঙ্করের মূর্তি দেওয়া এই জৈন স্থাপত্য রীতির নাম চৌমুখা। সম্প্রতি এটি মিলেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার পানরডাঙর গ্রামের কাছে দ্বারকেশ্বর নদ থেকে। চৌমুখা জৈন মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ। সাধারণত কোনও জৈন তীর্থক্ষেত্রে ভক্তেরা এগুলি উৎসর্গ করতেন। সামনে যে তীর্থঙ্করকে দেখা যাচ্ছে তিনি ঋষভনাথ। মাথায় সাপের ফণা দেওয়া পাশের তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। ইতিহাসবিদদের অনুমান, এই প্রত্নবস্তুটি নবম থেকে দ্বাদশ শতকের।

● **উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী আব্দুল রশিদ খান প্রয়াত :**

উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী আব্দুল রশিদ খান প্রয়াত হলেন। শতায়ু আব্দুল রশিদের জন্ম ১৯০৮-এর ১৯ আগস্ট উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলি জেলার সালোন শহরে। ১৮ ফেব্রায়ারি কলকাতার এক হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। রায়বেরেলিতে শিল্পীর শেষকৃত্য হবে। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্বালিয়র ঘরানার শিল্পী আব্দুল রশিদ ছিলেন বেহরাম খানের পরিবারের। তালিম পেয়েছিলেন জেঠামশাই বড়ে ইউসুফ খান ও বাবা ছোটে ইউসুফ খানের কাছে। পরে তিনি স্বতন্ত্র গায়কির ধরন অনুসরণ করেন। ২০১৩ সালে পান পদ্মভূষণ। শাস্ত্রীয় সংগীতের এই শিল্পী ছিলেন দক্ষ সুরকার এবং কবিও। ১৯৯১ থেকে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় থাকতে শুরু করেন তিনি। শেষদিন পর্যন্ত তিনি গুরু হিসেবে সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

● **১২টি ভাষায় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' :**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে এ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা-সহ ১২টি ভাষায় গাওয়া 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটির ভিডিও প্রকাশ করা হল। মালয়, আরবি, জার্মান, নেপালি, হিন্দি, ফরাসি, স্পেনীয়, রুশ, ইংরেজি, চীনা এবং ইতালীয় ভাষায় গানটি গাওয়া হয়েছে। শিল্পীরা ওই ভাষাভাষী দেশেরই।

২১ ফেব্রুয়ারি আর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' সমার্থকই বটে। ভাষা আন্দোলনের গানটি এতদিন বাংলাতেই গাওয়া হত। কখনও-সখনও অন্য ভাষাতেও গাওয়া হয়েছে। কিন্তু, একই সঙ্গে ১২টি ভাষায় এর আগে কখনও গাওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহিদদের অন্যভাবে শ্রদ্ধা জানাতে এই গোটা কর্মকাণ্ডের উদ্যোক্তা বাংলাদেশের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া নাবিদ সালেহীন।

নাবিদ জানান, গত বছরের মাঝামাঝি তিনি ১৬টি দেশের সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁদের অনুরোধ করেন ওই গানটি তাঁদের নিজস্ব ভাষায় গাইতে হবে। ১২ জন তাঁর ডাকে সাড়া দেন। পরে নাবিদ ওই শিল্পীদের অনুবাদ ও মিউজিক পাঠিয়ে দেন। শিল্পীরা গানটি গেয়ে এর পর ভিডিও-সহ তা পাঠিয়ে দেয় ওই তরুণকে। এর পরে বাংলাদেশে তার মিক্সিং-এর কাজ শুরু হয়।❑

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

PUBLICATIONS DIVISION

website: publicationsdivision.nic.in

Some Prestigious Titles Now Available Online

- India 2016 (also available as eBook)
- Bharat 2016 (also available as eBook)
- Legends of Indian Silver Screen (also available as eBook)
- Abode Under The Dome
- Winged Wonders of Rashtrapati Bhavan
- Right of The Line : The President's Bodyguard
- Indra Dhanush
- The Presidential Retreats of India
- Rashtrapati Bhawan
- Belief In The Ballot (also available as eBook)
- Gandhi : Jeevan Aur Darshan (hindi)
- 1857 The Uprising
- Sardar Patel-Sachitra Jeevni(hindi) (also available as eBook)
- Sardar Patel - A Pictorial Biography (also available as eBook)
- Basohli Painting
- Kangra Painting
- Indian Women : Contemporary Essays
- Bharat Ki Ekta Ka Nirman (hindi) (also available as eBook)
- Yuva Sanyasi (hindi)
- Gazetteer of India Vol.2
- The Geet Govinda of Shri Jaydev
- **Who's Who of Indian Martyrs (Vol-I)**
- **Who's Who of Indian Martyrs (Vol-II)**
- Saga of Valour
- Some Aspects of Indian Culture
- Art & Science of Playing Tabla (also available as eBook)
- Indian Classical Dance
- Celebration of Life : Indian Folk Dance
- **Nataraja**
- Bengali Theatre: 200 Years (also available as eBook)
- Bihari Satsai (hindi)
- Bihari Satsai - A Commentary
- Eye In Art
- Looking Again At Indian Art
- The Life of Krishna In Indian Art
- Pahari Painting of Nala Damayanti Theme
- Ajanta Ka Vaibhav (hindi)
- Bharatiya Kala - Udhbhav Aur Vikas (hindi)
- Bharatiya Chitrakala Main Sangeet Tatva (hindi)
- South Indian Paintings
- Garhwal Chitrakala (hindi)
- A Moment In Time
- Samay, Cinema Aur Itihas (hindi)
- Indian Cinema Through The Century
- Bharatiya Cinema Ka Safarnama (hindi)
- A History of Socialism
- Lamps of India
- Bharat Ke Durg (hindi)
- Wood Carving of Gujarat
- Lawns And Gardens
- Paryavaran Sanrakshan : Chunotiyan Aur Samadhan (hindi)

eBooks

- Lokmanya Bal Gangadhar Tilak
- The Gospel of Buddha
- Introduction To Indian Music
- Sardar Vallabhbhai Patel
- Sardar Vallabhbhai Patel (Adhunik Bharat Ke Nirmata Series)
- Lauh Purush Sardar Patel
- Aise They Bapu
- Mahatama Gandhi -A Pictorial Biography
- Gandhi In Champaran
- Mahatma Gandhi And One World

Printed Books available at flipkart.com
eBooks at kobo.com

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

April, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।